অনীক

মে ২০১৪
বর্ষ ৫০ □ সংখ্যা ১১
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

লোকসভা নির্বাচন ও আম জনতা ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ২
ভোটে টাকার খেলা! ❑ শ্যামল দাস ❑ ৩
সারদা-সিবিআই-ন্যায়দণ্ড ❑ সঞ্জয় বসু ❑ ৪

প্রবন্ধ

ভারতের মানচিত্র পুনর্নির্মাণ ❑ গোপাল কৃষ্ণ ❑ ৭
মার্কেজ-এর রাজনীতি বিষয়ক একটি দুটি কথা ❑ সুনন্দন চক্রবর্তী ❑ ১০
আমার কালের কথা ❑ বনবিহারী চক্রবর্তী ❑ ১২
হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ ও মুর্শিদাবাদ ❑ অরূপ চন্দ্র ❑ ২০

স্মরণ

খালেদ চৌধুরী স্মরণে ❑ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৬
প্রদীপ (খোকন) চ্যাটার্জী ❑ ভারতজ্যোতি রায় চৌধুরী ❑ প্রচ্ছদ ৩

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com
কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

নির্বাচন ও অতঃপর

রণাঙ্গন অবশেষে শান্ত। পত্রিকার এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে, দিল্লী জয়ের পর্ব ততদিনে সমাপ্ত, শাসনক্ষমতার সমীকরণও সাধারণ মানুষের গোচরীভূত। যারাই ক্ষমতায় আসুক, তাতে আমজনতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার যে কোনো সম্ভাবনা নেই, এ বিষয়ে অন্তত সন্দেহ থাকার কথা নয়। ভারত তো দুটি দলের কাছে বাঁধা পড়ে গেছে— বিজেপি বা কংগ্রেস। অন্য দলগুলির ভূমিকা, এই দুই দলের সাথে রাজনৈতিক দরকষাকষির মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তরে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং তাৎক্ষণিক কিছু সুযোগসুবিধা আদায় করা। আর কংগ্রেস বা বিজেপি, দু'টি দলই দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থার সেবাদাস। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষায় তারা রফা করতে দ্বিধা করে না। বিজেপি-র সহযোগিতা ব্যতীত ইউপিএ-২ সরকার পেনশন বিল, নয়া জমি অধিগ্রহণ বিল পাস করতে কি সমর্থ হতো, না কি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পথ সুগম করা সম্ভব হতো?

নির্বাচনে কেবল শাসক দলের রঙবদল হয়, সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যার কোনো সমাধান নির্বাচন করেনা। তবু সমাজে যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিস্তার ঘটে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ কিছু সুবিধা, কিছু অধিকার লাভের সুযোগ পায়। কতটুকু সুবিধা বা অধিকার মানুষ আদায় করতে পারবে, তা অবশ্যই নির্ভর করে সাধারণ মানুষের চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতার উপর। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-উত্তর ভারতব্যাপী কৃষক বিক্ষোভ পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের (২০০৯) পূর্বে যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল, সে ধরনের কোন রাজনৈতিক ইস্যু কিন্তু ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে সাধারণভাবে অনুপস্থিত। শাসকশ্রেণী এবার নিজের এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সুবিধা পেয়েছে।

সবথেকে আগ্রাসী ভূমিকা অবশ্যই বিজেপি সুপ্রীমো নরেন্দ্র মোদীর। জাতপাত-সাম্প্রদায়িক মনোভাবে উস্কানি দিয়ে তিনি যে ভাষায় ভোটপ্রচার করেছেন, তাকে দাঙ্গার অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায়না। এপ্রিল মাসে তিনি আসামে গিয়ে বললেন, "আসাম সরকার গণ্ডার মেরে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য জায়গা পরিষ্কার করছে।" মে মাসে নির্বিচার হত্যালীলায় ৪১ জন বাঙালী মুসলমান প্রাণ হারালো। বোরো-বাঙালি দ্বন্দ্বে তাঁর বক্তৃতা যে ইন্ধন যুগিয়েছে, এটা প্রমাণিত। "১৬ মে-র পর বাংলাদেশীদের পাততাড়ি গোটাতে হবে" বলে পশ্চিমবঙ্গে মোদী মহাশয় হুমকি দিয়ে গেলেন, অযোধ্যায় বক্তৃতা মঞ্চে রাম-এর চিত্র প্রদর্শন করে "হিন্দু" ভোটারদের তুষ্ট করার চেষ্টা করলেন। নরেন্দ্র মোদীর বিশ্বস্ত চেলা অমিত শা 'মুজাফফরনগরের' বদলা নেওয়ার জন্য জাট সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করলেন। নির্বাচন কমিশন কোথাও শক্ত হাতে বিষয়গুলির মোকাবিলা করলো না।

সবটা দেখে মনে হয়, নরেন্দ্র মোদীর উত্থানের পিছনে এক গূঢ় অভিসন্ধি আছে। ওবামা সরকার পরিকল্পনা মাফিক মোদীকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আগামী দিনে কর্পোরেট পুঁজির আক্রমণ আরও শাণিত হতে চলেছে। আর তার জন্য সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করতে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ-বীজ রোপন। বিজেপি-আরএসএস জুটির যে এ ব্যাপারে পারদর্শিতা আছে, এটা সর্বজনবিদিত।

শ্রমজীবী মানুষ, গরিব মানুষ প্রকৃতই এক ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি। এই মুহূর্তে তাদের অস্তিত্ব, অধিকার যে বিপন্নতার সম্মুখীন, তার কোনো পূর্বনজির নেই। বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদের সংকট ও জাতীয় স্তরে প্রবৃদ্ধির অধোগমন রোধে প্রতিক্রিয়ার অন্যতম সহায় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ। লাগামছাড়া লুটের কারবারিরা তাই মদত জোগাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীকে।

লোকসভা নির্বাচন ও আম জনতা

অনেক প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত রেখেই ভারতের মানুষ আবার একটি লোকসভা পেতে চলেছে। এই নির্বাচনকে 'ঐতিহাসিক' বলে যাঁরা প্রচার করছেন, তাঁদের মতে ভারতের মানুষের ভাগ্য এবারে যেমন ভাবে 'নির্ধারিত' হতে চলেছে, অতীতে কোনো নির্বাচনের ফলাফলে তেমনটি দেখা যায়নি।

বর্তমান অবস্থা কি অতীতের থেকে এতটাই ভিন্ন যে তাকে ঐতিহাসিক বলা যায়? কেন্দ্রে একচেটিয়া কংগ্রেসী জমানার অবসানের পর জনসংঘ তথা ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান শুরু হয়। দুই দফায় তারা দিল্লীর গদীও দখল করে। তাদের উত্থানে দেশে যে সাম্প্রদায়িক-সেকুলার তরজা শুরু হয়েছিল, সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'মণ্ডল' ও 'মসজিদ' কাজিয়া, সেই খেলা অবিরত চলছে। 'বাবরি বেয়ে বাজপেয়ীর' উত্থান।

ভারতে বেসরকারিকরণ - বিলগ্নিকরণ - বিদেশি পুঁজি আবাহনের আড়ালে দেশ বিক্রির একটি ক্রিয়াশীল প্রক্রিয়া গত দুই দশক ধরে দেশকে ছিবড়ে করে দিচ্ছে, গত কয়েকটি নির্বাচন সহ বর্তমান নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে তার কোনো প্রতিফলন নেই। তথাকথিত উদারনৈতিক আর্থিক সংস্কারের ওয়াশিংটন-নির্দেশিত পথটির বিষয়ে নয়াদিল্লীর প্রশ্নহীন আনুগত্য রয়েছে। ফলত নির্বাচন হচ্ছে একান্তই দলগত এজেন্ডায়, যার পিছনে থাকছে কর্পোরেট দুনিয়ার পেষণে ধুঁকতে থাকা ভারতের উপর শাইনিং ইন্ডিয়ার অনিঃশেষ শোষণের অধিকার কায়েম করার উদগ্র তাড়না।

ভারতের জনগণ পড়েছেন মহা সমস্যায়। অতীতে তাঁরা ভোটের মাধ্যমে স্বৈরাচারী ইন্দিরা জমানার অবসান ঘটিয়েছেন। রাজ্যে রাজ্যে জনাদেশে অত্যাচারী শাসকবর্গও বিদায় নিয়েছেন। যে যে বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয়েছিল, তার সঙ্গে আজকের অবস্থার প্রভেদ আছে। 'ইন্দিরা হটাও' একটিমাত্র শ্লোগান হাজির করে যে রাজনৈতিক জোট সেই সময় ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তাদের রাজনৈতিক চরিত্র মানুষের কাছে ছিল অজ্ঞাত। শেষ পর্যন্ত মানুষকে তারা হতাশ করে এবং পরবর্তীকালে জনাদেশ লাভে তারা বঞ্চিত হয়। কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতা লাভ করে। ইন্দিরা ও তারপর রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর আবার কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। সব পরীক্ষাই শেষ বিচারে অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। বিশ্ব পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আবার ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস উদারনৈতিক অর্থনীতির পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

এমন এক পশ্চাৎভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি দুই দফায় ক্ষমতায় আসে। তাদের আগ্রাসী সংস্কার কর্মসূচি এবং তার পরিণাম আমাদের স্মৃতিতে আজও অমলিন হয়নি।

এবারের নির্বাচনে এমন কোনো দল, এমন কোনো জোট হাজির নেই যাদের সম্পর্কে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার ঝুলিটি, বা বলা চলে খারাপ অভিজ্ঞতার ঝুলিটি, খালি।

নকশালবাড়ি ধারার অনুসারীরা এক সময়ে নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছিল। অনেকের মনে পড়বে যে ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংসদীয় বামপন্থীরা সিদ্ধার্থ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে তৎকালীন বিধানসভাকে 'সাজানো বিধানসভা' বলে সেই বিধানসভা বয়কট করে।

যাঁরা সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সংস্কার থেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তনে বিশ্বাসী বা যাঁরা সংসদে গিয়ে জনগণকে রিলিফ দেওয়ার মাধ্যমে বিদ্যমান ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণের দায় নিয়েছেন বা যাঁরা সংসদীয় পথ প্রত্যাখ্যান করে সংস্কারের পরিবর্তে সমাজ-বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন, তাঁদের কেউই এখনও পর্যন্ত শাসনতন্ত্র বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি রূপায়ণ-যোগ্য মোটাদাগের বিকল্পের রূপরেখা মানুষের কাছে হাজির করতে পারেন নি। আম-জনতা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্য পরিবর্তনের আশায় যুযুধান শক্তিগুলির মধ্য থেকে তাই নির্বাচন-যুদ্ধে বিকল্প খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন। খারাপ আর খুব খারাপের মধ্যেই তাদের পছন্দ সীমাবদ্ধ।

বর্তমান নির্বাচনে বিভিন্ন শক্তির বিন্যাস আম-জনতার কাছে তাই আগের নির্বাচনের চেয়ে নতুন কোনো ভয়ানক বিপদের ইঙ্গিতবাহী নয়, কিন্তু ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থাটিতে যে ঘুণ ধরেছে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সংসদীয় ব্যবস্থা ক্রমশ আস্থা স্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তা বোঝা যায় এবারের নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের অতি-সক্রিয়তা থেকে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ যখন প্রহসনে পরিণত হয়, সেই মতদান ব্যবস্থা পরিচালনায় রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা যখন কিছুই অবশিষ্ট নেই, তখন মানুষ মিলিটারির নির্বোধ শৃঙ্খলাপরায়ণতা, রাষ্ট্র-মনোনীত সংস্থার মধ্যে নিরপেক্ষতা দেখতে পাওয়ার মতো রাষ্ট্রিক ফাঁদে আটকা পড়েন। ভোটের প্রচারে সামিল স্বয়ং নির্বাচন কমিশন। করদাতা জনগণের টাকায় বিজ্ঞাপন থেকে হোর্ডিং, মোবাইলে মেসেজ— কী না করেছে। যেসব স্থানে ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেখানে গিয়ে মানুষকে বুথমুখী করার চেষ্টাও চালিয়েছে। কর্পোরেট দুনিয়াও পিছিয়ে নেই। ভোট দেওয়ার প্রমাণ দাখিল করলে পুরস্কার, হাতে ভোটের ছাপ নিয়ে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটার ওপর বোনাস ইত্যাদি। ঠিক যেন ধনতেরাস।

সব রাজ্যের শাসক দল যেভাবে সংবিধান অগ্রাহ্য করে ভোটকে তামাশায় পর্যবসিত করেছে, তাতে যাঁরা বয়কট পন্থী নন, তাঁদের মনেও ভোট ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন মেনে নিয়ে 'কাউকে পছন্দ নয়' বোতামটি ইভিএম-এ

যুক্ত হয়েছে— যা কার্যত ভোট বয়কটের স্বীকৃতি। রাষ্ট্রও জানে, ভোটের নামে মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রার্থী নির্বাচনের দিন প্রায় শেষ। তাই রাষ্ট্রও চাইছে, মানুষকে নানা কায়দায় ভেটের আঙিনায় সামিল করতে।

পারিবারিক রাজত্ব না সাম্প্রদায়িকতা, বর্তমান নির্বাচনে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রচারে যা অন্তরালে চলে যাচ্ছে, তা হলো বিশ্বায়ন, আর্থিক উদারনীতির মাধ্যমে কাঠামোগত পুনর্গঠন ইত্যাদি অত্যন্ত কেজো ও বাস্তব বিষয়গুলি। ১৯৯২ থেকে আজ পর্যন্ত, এনডিএ অথবা ইউপিএ— দুই দলই যখন পরস্পরের বিরোধী অবস্থানে ছিল, তখন তারা হাত মিলিয়ে ভারতের পেটেন্ট আইন সংশোধনীতে সমর্থন সূচক ভোট দিয়েছে; এনডিএ-র নিউক্লিয়ার ডকট্রিন এখন মনমোহন সিং-এর নিউক্লিয়ার নীতির মূল দিশা। দুটি জোটেরই লক্ষ্য কত দ্রুত দেশটিকে মার্কিন তথা বহুজাতিক ব্যবসায় সংস্থাগুলির মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত করা যায়।

রাজ্যে রাজ্যে জোটগুলিও মৃগয়ার এই 'মহাযজ্ঞে' সামিল। কী চন্দ্রবাবু নাইডু, কী জয়ললিতা বা নবীন পট্টনায়েক, নীতিশকুমার- মধু কোড়া- রমন সিংহ অথবা পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার বা বামফ্রন্ট— প্রত্যেকেই বিশ্বায়নের এজেন্ডা রূপায়নে সক্রিয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে।

বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা, যাকে জীবনীশক্তি যোগায় বিশ্বায়নের রাজনীতি-অর্থনীতি— তার টানে ভাসতে হবে ভারতের রাষ্ট্র পরিচালকদের সবাইকে। কেউই তার 'নিজস্ব ছাপ' বজায় রাখতে পারবে না। বিশ্বায়নের রথের ঘোড়ার খুরের তলায় বিমর্দিত হওয়াকে বিলম্বিত করার আকাঙ্ক্ষায় নির্বাচনী বিকল্প খোঁজা অনেকটাই নিষ্ফল। এ যেন নিজের বুড়ো আঙুল কেটে দুর্ঘটনা বীমার টাকায় জীবন কাটানো। ইউপিএ সরকার দেশের সম্পদ বিক্রি করেছে, কিক ব্যাক, টু-জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছে, জমি গ্রাস জারি রেখেছে। রাজ্যগুলির মধ্যে গুজরাট- মহারাষ্ট্রে কৃষক আত্মহত্যা, ছত্তিশগড়-ঝাড়খন্ডে ভিয়েতনামের আদলে ঘেটো, সালওয়া জুডুম, উড়িষ্যায় পস্কো ও নিয়মগিরি এবং এ রাজ্যে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও ব্যক্তি সন্ত্রাস— এগুলি হলো বিশ্বায়ন কর্মসূচি রূপায়নে রাজ্যগুলির ভূমিকার সামান্য কিছু নমুনা।

বিজেপি চাইছে কাজের সময় দশ ঘণ্টা করতে, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, চূড়ান্ত বেসরকারিকরণ আর কর্পোরেটদের সীমাহীন সুবিধা দান। কর্পোরেট দুনিয়ার ধারণায় ইউপিএ এই কাজগুলি আশানুরূপ দ্রুততায় রূপায়িত করতে ইতস্তত করছে। তাই তাদের দরকার রাফ এবং টাফ এক শাসক, যা তারা মোদীর মধ্যে দেখছে।

পশ্চিমবঙ্গের দুইটি যুক্তফ্রন্ট কিছু সদর্থক কাজের উদ্যোগ নিয়েছিল, যা সংসদে গিয়ে সক্রিয় অনুশীলনের সন্ধান দিতে পারতো। কিন্তু প্রথম বামফ্রন্ট সরকার সেই সদর্থক পথটি পরিহার করে। গত দুদশক বিকৃত সংসদীয় অনুশীলনের নীট ফল এই যে— সংসদীয় ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, সংসদীয় দলগুলি দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। সেই পাঁকে নকল পদ্মফুল ফুটলেও ফুটতে পারে, কিন্তু পাঁক পরিষ্কারের অনুশীলনের অভাব খুব প্রকট।

সমরেশ মিত্র

ভোটে টাকার খেলা!

এবারের লোকসভা নির্বাচন জাতীয়স্তরের দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও বিজেপি এবং তাদের ঘোষিত ও অঘোষিত বা পরে অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেবে এমন আঞ্চলিক দলগুলি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে তা একমাত্র মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথেই তুলনীয়। দেশি-বিদেশি করপোরেট মহল খুব পরিষ্কারভাবেই নরেন্দ্র মোদীর প্রতি তাদের দরাজ আনুকূল্য দেখাচ্ছে। ১২ মে শেষ দফার লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই বোম্বের শেয়ার বাজার এবং জাতীয় শেয়ার বাজার তাদের পূর্বতন রেকর্ড ছাড়িয়েছে। শেয়ার বাজারের দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আশা নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্ব সময়ের অপেক্ষা এবং উন্নয়ন সূচকের পরিপন্থী সব ধরনের বাধা তিনি অপসারণ করবেন। এই লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম শ্রেণীর জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলো কত টাকা খরচ করেছে বা করপোরেটরা কার প্রতি কতটা সদয়— তার ঠিকঠাক হিসাব পেতে আমাদের কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। আর এই করপোরেটদের প্রতি দায়বদ্ধতাই ১৯৯১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কংগ্রেস, বিজেপি জোট, ইউনাইটেড ফ্রন্ট বা ইউপিএ ১ ও ২— গোটা পর্বেই অর্থনীতি এগিয়েছে নয়া উদারবাদী রাস্তায়।

২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২ এই কালপর্বে— দেশি বিদেশি করপোরেট সংস্থা বিজেপিকে দিয়েছে ১৯২ কোটি টাকা এবং কংগ্রেসকে দিয়েছে ১৭২ কোটি টাকা। অর্থাৎ দুটি প্রধান জাতীয় দলের প্রতিই তাদের সমান আস্থা বা বিশ্বাস আছে। মোটামুটি প্রত্যেক শিল্পপতি-ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ভরসা-আস্থা দু'দলের প্রতিই সমান। আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী এই কালপর্বে কংগ্রেসকে দিয়েছে ৩৪ কোটি টাকা আর বিজেপিকে দিয়েছে ২৭ কোটি টাকা। সব বড় করপোরেট সংস্থা আর্থিক সাহায্য বিতরণ করেছে দুটি দলকেই সমানভাবে।

যদি বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলি ও অনতি-অতীতে ঘটে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনগুলিকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসা হয় তবে খরচ কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। ২০০৯-এর বিধানসভা নির্বাচনে ও লোকসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলি সহ দুটি প্রধান দল বিজেপি ও কংগ্রেস ২ থেকে ৬ কোটি টাকা খরচ করে বিধানসভা কেন্দ্র পিছু ও লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র পিছু খরচ করে ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি নরেন্দ্র

মোদীর উপস্থিতিতে বিজেপি নেতা ও লোকসভা সদস্য গোপীনাথ মুন্ডে বলেছেন তিনি ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মোট ৮ কোটি টাকা খরচ করেছেন। ইলেকশন কমিশনের বেঁধে দেওয়া অঙ্কের ৩২ গুণ বেশি। অন্ধ্রপ্রদেশ ২০০৯ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের দলগুলি ভোট পিছু খরচ করেছিল ২০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা। ২০০৯-এর অন্ধ্রে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন একসাথে হয়েছিল। এই খরচের মধ্যে ধরা হয়েছে মদ-মাংস খাওয়ানোর খরচ, ভোটারদের সরাসরি টাকা দেওয়া থেকে সমস্ত ধরনের প্রচারের খরচ। অন্ধ্রে ওই বছর নির্বাচনের জন্য রাজ্যস্তরের প্রধান তিনটি দল খরচ করেছিলো ২৬০০ কোটি টাকা। কুলদীপ নায়ার একটি প্রবন্ধে বলেছেন ২০১৩ সালে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম সারির দলগুলি খরচা করেছে ১২৯০৮ কোটি টাকা।

আগেই বলা হয়েছে বিজেপি নেতা গোপীনাথ মুন্ডে এক সভায় বলেছেন ২০০১-এর লোকসভা নির্বাচনে খরচ করেছিলেন ৮ কোটি টাকা। এর সাথে মূল্যবৃদ্ধি যোগ করলে এ বছরে আসন পিছু খরচ হবার কথা ১২ কোটি টাকা। প্রতি আসন পিছু যদি ধরা হয় অন্তত তিনজন প্রার্থী সমানে-সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তবে আসন পিছু খরচ হওয়ার কথা ৩৬ কোটি টাকার। সেক্ষেত্রে ৫৪৩টি আসনে খরচ হবে ২০,০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিস-এর সূত্র উদ্ধৃত করে রয়টার জানাচ্ছে এ বারের লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি খরচ করছে প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা।

এবারের নির্বাচনে কংগেস ও বিজেপি ৫০০ কোটি ও ৪০০ কোটি টাকা খরচ করবে বিজ্ঞাপন বাবদ। ম্যাডিসন মিডিয়ার মতে রাজনৈতিক দলগুলির বিজ্ঞাপন বাবদ এবারের নির্বাচনে খরচ করবে প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকা। এছাড়াও করপোরেট মিডিয়া ব্যারনদের জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলির জন্য খরচের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যেমন রিলায়েন্স গোষ্ঠীর অধীন নেটওয়ার্ক ১৮ মিডিয়া গ্রুপ সক্রিয়ভাবে নরেন্দ্র মোদীকে তুলে ধরেছে। নির্বাচন বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ অল্প সময়ের মধ্যে এতটাই যে এই ব্যয় সাময়িকভাবে হলেও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে। অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদ মাধ্যমগুলির মতে নির্বাচনের সময় মদের বিক্রি, মাঝারি গাড়ির বিক্রি (SUV) বেড়ে যায়। মিডিয়া এজেন্সিগুলির আয় হঠাৎই বেড়ে যায়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে করপোরেট-কুলপতিরা এত অর্থ খরচ করেন কেন? অবশ্যই তাঁদের স্বার্থে। আগত সরকার যেন বিগত সরকারের মতই করপোরেটকুলের স্বার্থে দেশের সম্পদ কুপন কেটে বা নিলাম করে তাদের হাতে তুলে দিতে পারে। সেইজন্যই ১৯৯০ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকার এসেছে, কিন্তু নয়া উদারবাদী নীতির কোন হেরফের ঘটেনি। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারে বসে আছে পুরোনো কয়েকটা মুখ। তাঁরা কখনও কোনো পিট্রোদা বা আলুওয়ালিয়া। আর তাঁদের একটাই মন্ত্র। আরো প্রবৃদ্ধি। কিন্তু মূল প্রশ্নটা হচ্ছে এই প্রবৃদ্ধি-শাঁসটা কে খাচ্ছে আর কার কাছে যাচ্ছে ছিবড়ে বা উচ্ছিষ্টগুলো?

শ্যামল দাস

তথ্যগুলি Analylical Monthly Review, April 2014 থেকে নেওয়া

সারদা-সিবিআই-ন্যায়দণ্ড— হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত

৯ মে ২০১৪ সর্বোচ্চ ন্যায়লয়ের আদেশবলে সারদা চিটফান্ডের তদন্তভার সিবিআই-এর উপর ন্যস্ত হয়েছে। আর এই রায়টি ঘোষিত হয়েছে শেষ দফার লোকসভা নির্বাচনের ৭২ ঘণ্টা আগে। সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নাম জড়িয়েছে এবং তাদের এক রাজ্যসভা সদস্য জেল খাটছে। আরও এক রাজ্যসভা সদস্যের নাম প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিরোধীরা, বিশেষত বামফ্রন্ট এই রায়ে খুশি। তাদের ধারণা এই রায় দক্ষিণবঙ্গে যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে ও তাদের ভোট বাড়বে। লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে লড়াইটা যেন তৃণমূল-বিজেপি হয়ে যাচ্ছিল। এই রায় কিছুটা হলেও একটা পরিসর দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেছে সারদা কেলেঙ্কারির জাল তিন রাজ্যে বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং আসাম। কোন রাজ্য পুলিশের পক্ষে এই তদন্ত সম্ভব নয়। সংগৃহীত টাকার কিছু অংশ বিদেশেও পাচার হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। এমনকি সত্য উন্মোচনের জন্য সেবি, রেজিস্ট্রার অব কোম্পানি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসারদের তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। কারণ এই দপ্তরগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তাদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করলে এতবড় কেলেঙ্কারি ঘটতে পারতো না। এছাড়া সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় তার রায়ে পরিষ্কারভাবে বলেছে সারদা গোষ্ঠী 'হাই পোজিশন'-এর ব্যক্তিদের 'প্যাট্রনেজ' পেয়েছে। সুতরাং সিবিআই-এর মত কোন বিশেষ দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পন্ন বিভাগই এই তদন্তের উপযুক্ত।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই আদেশের আগেই এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তের ব্যাপারে বেশ কিছুটা অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অর্পিতা ঘোষকে তারা কয়েক দফা জেরা করে। সারদা-প্রধান সুদীপ্ত সেনের দ্বিতীয় স্ত্রী ও এক পুত্রকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা থেকেই। রাজ্য সরকারের বিশেষ তদন্ত দল 'সিট' যাদের গত এক বছরের মধ্যে ধরতে পারেনি যা ধরার চেষ্টা করেনি। সংবাদ মাধ্যমে খবর সবিস্তারে প্রকাশিত হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত সারদা চিটফান্ড সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে, প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা তারা পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও আসাম থেকে সংগ্রহ করেছে। সেবি রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের সংগ্রহের পরিমাণ ২৪৫৯ কোটি টাকা। সারদার মোট এজেন্টের সংখ্যা ২,২১,০০০। সারদার অন্তর্ভুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা ১৬০টি। কিছুদিন আগে জনৈক মহিলা কলকাতার কাছেই আত্মহত্যা করেন। তিনি ছিলেন সারদার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার। তৃণমূল সরকারের জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর সাথে সেই মহিলার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে অনেক খবর বেরিয়েছিল অনতি-অতীতে।

লোকসভা নির্বাচনের শেষ পর্বে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই রায় পার্লামেন্ট রাজনীতির পারমুটেশন-কম্বিনেশন অনেক নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কংগ্রেস বা বিজেপি নেতৃত্বাধীন কোন জোট ক্ষমতায় আসবে, এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত তা অনিশ্চিত। সে অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস বা তার নেত্রী মমতা ব্যানার্জী হয়তো হিসেব কষবেন সিবিআই তদন্ত ধামা চাপা দেবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে যাওয়াটাই তাঁর পক্ষে মন্দের ভালো। বা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্মাণে তাঁর দলের ভূমিকা তাঁর বিচারে ফেলে দেবার মতো হবে না। যাই ঘটুক, 'শিকলবন্দী ময়না' (সিবিআই) যদি শিকলের ফাঁকফোঁকর দিয়ে তদন্ত দ্রুত শেষ করতে পারে তবে ২০১৬-র রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর দলের বেশ কয়েকটা কেষ্টবিষ্টুর দশা যে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মতো হবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দলনেত্রী হিসাবে তিনিও চাইলেই সব পাঁক ধুয়ে ফেলতে পারবেন এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

যদিও একথা আমাদের জানা আছে যে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে তালা ঝোলানো চিটফান্ডগুলি গজিয়ে উঠেছিলো ৩৪ বছরের বাম জমানার শেষ দিকে। আবার সারদা সহ বেশ কয়েকটি চিটফান্ডের টাকার জোগান বেড়েছে ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত গুণোত্তর শ্রেণীতে। অর্থাৎ পরিবর্তন জমানার শুরুতে।

একটা ব্যাপার আশ্চর্য মনে হয়। এই জাতীয় সংস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতে একাধিক সংস্থা আছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবি ইত্যাদি। এতদিন এরা কী করছিল? আর একটা Non Banking Financial Corporation Company সাহারা (যার কর্তা এখন তিহার জেলে বন্দি) ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পনসর। সাহারা-প্রধানের ব্যক্তিগত আতিথেয়তার তালিকায় ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, দেবগৌড়া থেকে শুরু করে বিল ক্লিন্টন। কয়েক হাজার কোটি টাকা মেরে দেবার পর অবশ্যই রাজনৈতিক যোগসাজসে ভারত সরকারের উপরিলিখিত দপ্তরগুলি কাঁচা ঘুম ভেঙে নড়ে-চড়ে বসে। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সে কারণেই উপরিলিখিত সংস্থাগুলি সম্পর্কে রায়ে বলেছেন— "Investigation conducted so for puts a question mark on the role of regulatory authorities like SEBI, Registrar of Companies and officials of RBI within whose respective jurisdictions and areas of operation the scam not only took birth but flourished unhindered."।

রায় ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সারদায় বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরানোর দায়িত্ব সিবিআইকে নিতে হবে। তিনি টাকা ফেরানোর চেষ্টা করছিলেন। এখন তাঁর আর কোন দায় নেই। ভাবখানা এমন যে ১০০০০ কোটি টাকা বা সেবি-র হিসেব অনুযায়ী ২৪৫৯ কোটি টাকা তিনি বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেবার ব্যবস্থা করেই ফেলেছিলেন। টাকা ফেরত দেবার বাস্তব চিত্রটা ভুক্তভোগীরা জানেন। আর মুখ্যমন্ত্রীও জানেন কিছু লোককে যদি টাকা ফেরত দেওয়া যায় তবে বাকিরা আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করবেন। যে সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা দিতে পারে না, বাজার থেকে টাকা ধার করে সরকার চালায়— তারা ১০০০০ কোটি বা ২৪৫৯ কোটি টাকা ফেরত দেবে শুনলে মনে হয়— 'কইয়েন না কর্তা ঘুড়ায় হাসব'। যাই হোক এই রায় সম্ভবত মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে থাকবে।

সারদার বিনিয়োগকারীদের সংখ্যার বিচারে সংখ্যাগুরু ছিলেন গরিব, নিম্নবিত্ত মানুষজন। বাড়িতে কাজ করেন এমন মহিলা, রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, অটো চালক, নির্মাণ ক্ষেত্রে কর্মরত দিনমজুর থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আমজনতা। কেন তাঁরা এখানে টাকা রেখেছিলেন, এ জাতীয় প্রশ্ন কেউ কেউ তুলছেন বটে। তাঁদের জন্য বলি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরেদের এক অংশও সারদা বা অন্য চিটফান্ডের মাসিক যোজনায় টাকা রেখেছিলেন। মূলে কারণ অবশ্য আরও সুদের বা চটজলদি টাকা বাড়িয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সিবিআই তদন্তের নির্দেশের ফলে সিপিআইএম সহ বামপন্থীরা বা বিজেপি-কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা জুতসই অস্ত্র পেলেন বটে নির্বাচনী লড়াইয়ে। তাঁদের অশ্রু বিসর্জন ভোটবাজারে কিস্তিমাত করার জন্য। মোটেই হাকিম শেখ, রামা কৈবর্ত্ত, রমলাদি, কমলাদি বা জাহানারাদের মত সারদায় লগ্নিকারীদের জন্য নয়।

যাঁরা এখনও প্রথাগত বর্গগুলির বাইরে গণআন্দোলনের কথা ভাবেন তাঁরাও এক্ষেত্রে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন কিনা সেটাই দেখার। কারণ সরকারি পার্টি-নির্ভর নয় এমন গণআন্দোলনই পারে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফিরিয়ে দিতে ও দোষীদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে।

সঞ্জয় বসু

স্মরণ

খালেদ চৌধুরী স্মরণে

(২০.১২.১৯১৯ - ৩০.৪.২০১৪)

সেই প্রবৃদ্ধ মানুষটি চলে গেলেন; আর রেখে গেলেন স্মৃতিধৃত গল্পের একটি ঝাঁপি। অবিভক্ত আসামের করিমগঞ্জের গ্রামে তাঁর শৈশব, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিলেট, মন্বন্তর; তারপর কলকাতায় চলে আসা, দাঙ্গা-দেশভাগ, গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী— কত গল্পই না শুনেছি তাঁর মুখে, সেই ১৯৭৬ সাল থেকে। খালেদদা গল্প বলতেন বেশ সরস ভাষায়, ব্যঙ্গকৌতুক মিশিয়ে। সেসব ছিল গল্প-ই; তবে তার ভেতর ধরা থাকত সময়ের একটা প্রকীর্ণ ছবি যা সবসময় খুব মধুর বা প্রীতিকর নয়।

মাতৃহারা কিশোর চিররঞ্জন, সম্পর্কে গুরুসদয় দত্তের নাতি— বাবার অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালিয়ে, দু-একটা জায়গায় ঘুরে অবশেষে এক মুসলমান পরিবারে কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় পাওয়া— নতুন নাম : 'খালেদ'— ধরে রাখলেন, পরে বিখ্যাত হলেন সেই নামেই। অনেক নিকটজন-ও তাঁকে মুসলমান বলে জানতেন। তিনি কোনোদিন ভুল-ভাঙানোর চেষ্টা করেননি; একদিন প্রশ্ন করায় একটু বিরক্ত হয়েই যেন বলেছিলেন : 'ভাবুক না, আমি তো ধর্মটর্ম মানি না'। গণনাট্যর হয়ে গ্রামে গান গাইতে গিয়ে শুনেছিলেন: নাম পালটাতে হবে; কারণ 'বাড়িতে বিধবা পিসিমা আছেন'। খালেদদা নাম বদলাননি, সেই বাড়িতে আশ্রয়-ও নেননি। অনেক পরে একদিন বলেছিলেন: 'সেদিনই বুঝেছিলাম এ-দেশে কমিউনিস্টরা কেমন হবে।'

গণনাট্য সঙ্ঘে এসেছিলেন গান গাইতে; চিত্তপ্রসাদের প্রেরণায় পোস্টারের ছবিও আঁকতে লাগলেন — আঁকার হাত ছিল ছোটোবেলা থেকেই, মাটি দিয়ে মূর্তিও গড়তেন। গলা খারাপ হয়ে যাওয়ায় গান-গাওয়া বন্ধ হলো; ক্রমে খালেদ চৌধুরী হয়ে উঠলেন প্রচ্ছদশিল্পী। সেই পরিচয়টাই খালেদদা ধরে রাখতেন, নিজেকে চিত্রশিল্পী বলে দাবি করতেন না। আর মঞ্চনির্মাণ শিল্প? ওটা তো শম্ভু মিত্রর অনুরোধে হঠাৎই-শুরু-হওয়া— 'আগে কোনোদিন ভাবিনি'। বাড়িতে গ্রীক নাটকের ওপর দামি বই দেখেছি।— বোধহয় 'অয়াদিপাউস'-এর সময় কিনেছিলেন। ১৯৭৬ সালে— সময়টা তখন খুব খারাপ; জরুরি অবস্থা। টেবিলের ওপরেই থাকত রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর'; মাঝে মাঝেই পড়তেন, বিশেষ করে : 'বাতায়নিকের পত্র'।

গান তো তাঁর রক্তেই ছিল; মাঝিমাল্লার গান শুনে বড়ো হয়েছেন, 'ধামাইল' নাচের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শৈশবেই। লোকসঙ্গীত সংগ্রহ আর তাই নিয়ে গবেষণা আরও অনেক পরে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো ডিগ্রি ছিল না; অথচ বিশ্বসাহিত্যের খবর রাখতেন; জানা ছিল পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ব্যাকরণ; বেহালা বাজাতে পারতেন। সবদিক থেকে স্ব-শিক্ষিত; আদ্যন্ত স্বাধীনচেতা। প্রকাশক একটি প্রচ্ছদ পছন্দ না করায় একবার তার চোখের সামনেই দু-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন ছবিটা। সেই থেকে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কেউ-কেউ তাঁকে ভয় করত— গল্পটা বলেছিলেন বেশ রসিয়ে। জনপ্রিয় করে তোলার অছিলায় লোকসঙ্গীতের বিকৃতি একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। ওইসব গানের ধাতটা কেমন? আমার মতো আনাড়িকেও বুঝিয়েছিলেন: ভাটিয়ালি দরাজ গলায়, উচ্চগ্রামে, মাঝি গাইছে যেন বিশ্বচরাচরকে শুনিয়ে; কিন্তু আলপনা দেওয়ার সময় মেয়েদের গান ঢিমে লয়ে, ধীরে ধীরে: 'আঁকতে আঁকতে গাওয়া যে'!

ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর একটা শ্যাডো প্লে করেছিলেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে 'শিশুতীর্থ' নিয়ে একটা ছায়ানাট্যের পরিকল্পনা করেছিলেন তাপস সেনের সঙ্গে— সেটা হয়নি। আপাতভাবে দুঃখবিষাদের কোনো প্রকাশ খালেদদার মুখে দেখিনি; তবে মনে তিক্ততা ছিল, অসন্তোষ ছিল। চারপাশের শব্দ আর প্রতিবেশীদের অসৌজন্যে বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে কানে যন্ত্র লাগিয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনতেন নিবিষ্ট হয়ে। গণনাট্যের আসরে 'হে নূতন' গানটা দেবব্রত বিশ্বাস কীভাবে গেয়েছিলেন— একদিন শুনিয়েছিলেন একটুখানি। রামকিঙ্কর, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোর, প্রাণকৃষ্ণ পাল, শর্বরী রায় চৌধুরী— আরও অনেকের কথাই শুনেছি। আশি বছর পার করে দিয়েও ভাড়া-ঘরে, ভাড়া-আসবাবপত্র নিয়ে মাথা উঁচু করে আনন্দে বেঁচেছেন খালেদদা— শরীরে কষ্ট পেয়েছেন শেষ বছর দশেক। কেমন ছিলেন মানুষটি? প্রায় চল্লিশ বছরে অনেক স্মৃতি! একটাই শুধু বলি।

১৯৭৯। আমার একটা ছোটো বই বেরোবে লোকশিল্প নিয়ে। আমার দাবি : খালেদদা ছবি আঁকবেন আর টাকাটা আগেই দিয়ে দিতে হবে। প্রকাশক মেনে নিলেন; কিন্তু যে অর্থ দিলেন, তাতে খালেদদার ভাষায় : 'দুটোর বেশি ছবি হয় না'। মাত্র দুটো! কিন্তু কী আর করা যায়! যেদিন সকালে ছবি নিতে গেলাম, খালেদদা বুঝেছিলেন, আমার মন খারাপ। সেইদিনই বিকেলে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় চিত্তপ্রসাদের চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন। বললেন : 'আসছ তো!' বিকালে দেখা হতেই একটা খাম দিলেন : 'আরেকটা ছবি দিলাম। সারা দুপুর ধরে এঁকেছি। চলো, ছবি দেখি। খেয়াল করো, চিত্তপ্রসাদের ছবিতে শিশুরা সবসময় হাসিখুশি।' শিশুর মতো হাসলেন খালেদদা।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

ভারতের মানচিত্র পুনর্নির্মাণ— বিজেপি স্টাইল

গোপাল কৃষ্ণ

২০১৪ সালে বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তেহারে 'সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে নদী সংযুক্তিকরণে'র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এটা করা হয়েছে স্থানীয় দলগুলির জন্য, যারা তাদের রাজ্যের জলসম্পদ ইতিমধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলেছে। এই বার্তাটা আরো ভালো করে মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী বলেছেন, ''গুজরাটে আমরা ২০টি নদী সংযুক্ত করেছি, আর কৃষির প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ১০ শতাংশ।'' ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও বিজেপি-র ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ''কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পরিকাঠামো কর্মসূচিতে, বিশেষত রাস্তা ও হাইওয়ে তৈরি ও নদী সংযুক্তিকরণে, প্রচুর সরকারি বিনিয়োগ'' করা হবে।

২০০৪ সালে এনডিএ-র ''উন্নয়ন, ভালো পরিচালনা ও শান্তি কর্মসূচি : লোকসভা ২০০৪'-এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ''২০০৪ সালের ১৫ আগস্টের মধ্যেই নদী সংযুক্তিকরণ শুরু হবে। প্রথম দফার প্রকল্পগুলি জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে করে ফেলা হবে। প্রকল্পের কারণে অসুবিধায় পড়া লোকদের পুনর্বাসন প্রকল্প ঠিক করা হবে ও তা করে ফেলা হবে।'' এর আগে ২০০৯ সালে বিজেপি-এনডিএ গর্বিত, সমৃদ্ধ ভারতের কর্মসূচি : লোকসভা ১৯৯৯'-এ বলা হয়েছিল, ''আমরা গঙ্গা-কাবেরি সংযুক্তি-করণের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখব এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব''।

১৯৯৯ সালে জাতীয় জলসম্পদ উন্নয়ন কমিশনের প্রধান অধ্যাপক এস আর হাসিম সংযুক্ত জলসম্পদ বিকাশ পরিকল্পনা পেশ করেন। সেই পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে ''হিমালয় থেকে আসা নদীগুলির সংযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সহজে পাওয়া যায় না, কিন্তু সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয় যে বর্তমানে ২০৫০ সাল পর্যন্ত যে পর্যালোচনা চলছে তার মধ্যে নদী সংযুক্তিকরণের বিষয়টি সম্ভবপর হবে না।''

২০০২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৪ আগস্ট তাঁর বক্তৃতায় বিষয়টিকে সমর্থন করে বলেন, ''দেশের এক অংশে যখন বন্যা তখন অন্য অংশে খরা চলছে— এটা অদ্ভুত ব্যাপার। এই খরা-বন্যার বিষয়টি বারবার ফিরে ফিরে আসে। সময়ের দাবি হলো একটি জল মিশন গড়া, যা জমিতে, গ্রামে, শহরে, শিল্পে সারা বছর ধরে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, পাশাপাশি পরিবেশগত শুদ্ধতাও বজায় রাখবে। জল মিশনের একটি বড় কাজ হবে আমাদের নদীগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। আমাদের দেশের প্রযুক্তিগত ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা একাজে লাগাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে।'' সরকারের মধ্যেই নদী সংযোগ বা সংযুক্তিকরণ নিয়ে যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে জানতে চাইলে তিনি জানতে পারতেন যে ভালো করে অনুসন্ধান করার পর NCWRD এটি প্রত্যাখ্যান করেছে। কালামের ঐ বক্তৃতা আসলে ১৯৯৯ সালের বিজেপি ম্যানিফেস্টোর প্রতিধ্বনি, যেখানে গঙ্গা ও কাবেরী নদী সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। কিংবা তিনি হয়ত কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়াই কল্পনার মায়াজাল বুনছিলেন।

নদী সংযুক্তিকরণের কথা প্রথম আসে ১৯৭২ সালে, যখন ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী কে এল রাও গঙ্গা-কাবেরী সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব আনেন। কেন্দ্রীয় জল কমিশন সেই প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখে এর ফলাফল ''অত্যন্ত কম করে ভাবা হয়েছে'' বলায় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রক এটি প্রত্যাখ্যান করে। এরও আগে কাপ্তেন দস্তুর হিমালয়ের নদীগুলি ও দক্ষিণের নদীগুলিকে ঘিরে ''খালের মালা'' নির্মাণের প্রস্তাব দেন। দেখা যায় যে এটি ''প্রযুক্তিগতভাবে সঠিক নয় এবং অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব ব্যয়সাপেক্ষ''। এইভাবে বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু অজানা গোষ্ঠী এটি করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে, ভারত সরকারের প্রধানদের মনে এটি ঢোকানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

লক্ষণীয় যে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানিও বলেছেন যে ''সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি যৌথভাবে নদী সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ভারত জোড়া জল সম্পদ গড়ে তুলতে পারে।''

এই 'নদী সংযোগ'-এর অর্থ এক নদী থেকে অনেক অনেক জল নিয়ে তা অন্য নদীতে ঢালা নয়, এমনকি খালের মাধ্যমে এক নদী থেকে অন্য নদীতে জল নিয়ে যাওয়াও নয়। এই সংযুক্তিকরণের ফলাফল অনেক বিস্তৃত। কারণ নদী তো শুধু একটি নির্দিষ্ট খাত দিয়ে বহমান জল বা সেই খাতটি নয়। নদী হলো প্রকৃতির বহমান চলমান মুখ। ইতিহাসের নাটকে পরিবেশতন্ত্র কিন্তু নাটকের মঞ্চ নয়, নাটকের নটনটী।

কালাম সাহেব দাবি করেছেন যে নদী সংযুক্তিকরণ ৩০,০০০ কোটি কিউবিক মিটার অতিরিক্ত জল দেবে। কিন্তু জাতীয় জল উন্নয়ন সংস্থা (NWDA) বলছে ১৭৪০০ কোটি কিউবিক মিটার জলের কথা। হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রকল্পের খালগুলি ৬,২৫,০০০ হেক্টর জমি প্লাবিত করবে, আর জলাধারগুলি প্লাবিত করবে ১০,৫০,০০০ কোটি হেক্টর

এলাকা। এর ফলে ৩১.৪ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হবেন। তিনি বারবার বলেছেন যে বন্যার ফলে ৮টি নদী উপকূলের মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হন— ৪ কোটি হেক্টর এলাকা ও ২৬ কোটি মানুষ।

কিন্তু নদী সংযুক্তিকরণের ফলে যে 'অতিরিক্ত' জল অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যাবে তার পরিমাণ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মহানদীর মতো নদীর বন্যার সময়কার জলের ২-২.৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় জল কমিশন, NWDA ও অখণ্ড জলসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার জাতীয় কমিশনও একই কথা বলছেন।

কালাম সাহেবের এই বক্তৃতা সামনে রেখে সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদন করা হয়েছিল তাতে সুপ্রিম কোর্টের রায় নদী সংযুক্তিকরণকে আবার সামনে এনেছে। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে সেটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিকাঠামো প্রকল্প আর তা চিরকালের জন্য এদেশের ভূগোলকে বদলে দেবে। পরিবেশগতভাবে এটা কি করার যোগ্য?

যারা প্রকল্পের পক্ষে তাঁরা বলেন, "এই প্রকল্প না করলে তার জন্য কী দাম দিতে হবে" তার কথা। তাদের কথার অর্থ এই যে, প্রকল্পটি না নিলে বিরাট একটা সুযোগ নষ্ট হবে, এর দাম দিতে হবে। কিন্তু তাঁরা 'সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক অফ ড্যাম্‌স, রিভার্স অ্যান্ড পিপ্‌ল' (SANDRP) উত্থাপিত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। ভারতে নদী উপত্যকায় মাটির নিচের জলের নবীকরণ সহ বৃষ্টির জল ধরে রাখার বিষয়টি অবহেলা করার জন্য কী দাম দিতে হয়? আমাদের নদী উপত্যকাগুলির জলবিভাজিকার উন্নয়ন ঘটানোর চিন্তা না করার জন্য কত দাম দিতে হচ্ছে? যে স্থানীয় জলব্যবস্থাগুলি রয়েছে সেগুলি না সারানোর, সেগুলির উন্নতি না করার দাম কত? বর্তমান জলাধারগুলি থেকে পলি না তোলার ফলে সেগুলি যে তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, তার দাম কতটা দিতে হচ্ছে? ভারতের সেচ ব্যবস্থা, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেচ পরিকাঠামো, তার থেকে সঠিক ফল না পাওয়ার দাম কত? কৃষি ক্ষেত্রে নিকাশী ব্যবস্থা রক্ষা না করার দাম কত? ভারতের মিষ্টি জলে দূষণ বন্ধ না করার দাম কত? জল ও শক্তি ব্যবস্থায় চাহিদা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন যাচাই না করার দাম কত? জল ও শক্তি যোগান ব্যবস্থা থেকে যে পরিমাণ জল ও শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে, চুরি হচ্ছে, সেগুলি বন্ধ না করার ও অবস্থাপন্ন মানুষদের পরিষেবার জন্য মূল্য দিতে বাধ্য না করার জন্য কী দাম দিতে হচ্ছে? চিনি ও খাদ্যশস্য রপ্তানিতে বিরাট পরিমাণ ভরতুকি দেওয়ার ফলে যে বিরাট পরিমাণ জল 'গোপনে রপ্তানি' হয়ে যাচ্ছে, তা বন্ধ না করার দাম কতখানি? চূড়ান্ত চাহিদার ঠিকমত ব্যবস্থাপনা না করার, সেই সময় বেশি দাম না নেওয়ার, সেই সময় বর্তমান জলবিদ্যুৎ ক্ষমতাকে ব্যবহার না করার দাম কত? আর শেষত, বাঁধের নিচের অংশে যথেষ্ট জলের যোগান না দেওয়ার দাম কত?

যারা এই নদী সংযুক্তিকরণ চাইছে তারা এই ধরনের প্রকল্পের বিরোধীদের বুদ্ধু বানানোর জন্য দুটি পরিকল্পনা করে রেখেছে। পরিকল্পনা ক ও পরিকল্পনা খ। রাজ্যগুলির প্রস্তাব হলো পরিকল্পনা খ-র অংশ। আর জাতীয় স্তরে নদী সংযুক্তিকরণ হলো পরিকল্পনা ক। নদী সংযুক্তিকরণের জন্য মোট খরচ হিসাব করা হয়েছে ১,২৫,৩৪২ কোটি টাকা (২০০২-০৩-এর হিসেবে)। এটির লক্ষ্য হলো অতিরিক্ত জল সংরক্ষণ ক্ষমতা তৈরি এবং জল-উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে খরাপ্রবণ এলাকায় জল নিয়ে যাওয়া। এক নদী উপত্যকা থেকে অন্য নদী উপত্যকায় জল নিয়ে যাওয়া। দাবি করা হয়েছে যে এর ফলে প্রায় ৩ কোটি হেক্টর জমিতে বাড়তি সেচ দেওয়া যাবে এবং ২০,০০০-২৫০০০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি হবে।

জাতীয় জল উন্নয়ন সংস্থা দাবি করে যে গঙ্গা, কোশি ও গন্ডক নদীতে জল উদ্বৃত্ত, কিন্তু বিহার সরকার সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্য থেকেও এ ধরনের বিরোধী কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। ২০০৫ সালে জয়রাম রমেশ সংসদে বলেছিলেন, "...আমার মতে, বিশালভাবে নদী সংযুক্তিকরণ করা হলে তার চেয়ে বড় বিপদ আর হতে পারে না।" কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং বিজেপি-র বর্তমান নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে নদী সংযুক্তিকরণ নিয়ে বিজেপি-র সমর্থন প্রকাশের পর জয়রাম রমেশ ও কংগ্রেস নেতৃত্ব সবাই চুপ করে আছেন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি নেতৃত্বাধীন গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ সরকার এবং সমাজবাদী পার্টির নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ সরকার নদী সংযুক্তিকরণ নিয়ে মউ সই করেছে। এমনকি জেডি(ইউ) নেতৃত্বাধীন বিহার সরকারও নদী সংযুক্তিকরণের প্রকল্প নিতে উৎসাহী। কেরালা, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের মতো যেসব রাজ্য আগে নদী সংযুক্তিকরণের পরিকল্পনা ক প্রত্যাখ্যান করেছিল, এখন তারা রাজ্য স্তরের পরিকল্পনা খ-র ফাঁদে পড়ে গেছে। জাতীয় নদী উন্নয়ন সংস্থার প্রস্তাব ছিল ৩০টি প্রধান নদী সংযোগকারী খাল তৈরির, যাতে সারা দেশ জুড়ে ৩৭টি নদী যুক্ত থাকবে, আর যা তথাকথিত জল-উদ্বৃত্ত নদী উপত্যকা থেকে জলাভাব আছে এমন নদী উপত্যকায় জল পরিবহন করবে।

নদীর নিচের অংশে অবস্থিত হওয়ায় বিশেষত বাংলাদেশ এতে মুশকিলে পড়বে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্বীকার করা হয়েছে যে ভারত, ভুটান ও নেপালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের যে উপনদীগুলি আছে সেগুলির উপর জলাধার তৈরির ফলে এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাংলাদেশও এর ফলে অসুবিধায় পড়বে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তার কোনো উল্লেখ নেই।

মজার কথা হলো, বিচারপতি স্বতন্তর কুমার, যিনি বিশ্বের

সবচেয়ে বড় পরিবেশগত বিপর্যয়কারী প্রকল্পটি করার রায় দিলেন, তিনি এখন জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান, যে ট্রাইব্যুনালের কাজ হলো পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ করা।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফল অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চের (NCAER) একটি গবেষণায় এ বৈদ্যনাথনের ২০০১ সালের গবেষণাপত্র 'ইরিগেশন সাবসিডিস' ও বৈদ্যনাথনের নেতৃত্বে প্ল্যানিং কমিশনের 'রিপোর্ট অফ দা কমিটি অন প্রাইসিং অফ ইরিগেশন ওয়াটার'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ 'উদ্বৃত্ত' জলের কল্পকথা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বক্তব্যকে হিসাবে আনা হয় নি। হিসাবে আনা হয়নি NCAER-র নতুন হিসাব করা মোট খরচকেও— ১,২৫,৩৪৩ কোটি, তাদের আগের হিসেব (২০০২-৩ সালের টাকার মূল্যে ৫,৬০,০০০ কোটি) থেকে যা ২২.৪ শতাংশ কম।

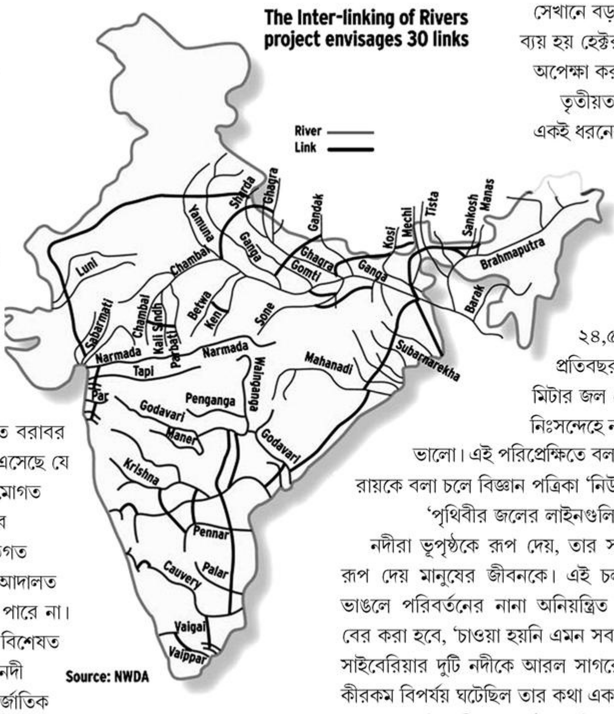

আগে, আদালত বরাবর সঠিকভাবেই বলে এসেছে যে বড় বড় পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি এমন সব প্রযুক্তিগত ও নীতিগত বিষয় তুলে আনে আদালত যার সমাধান দিতে পারে না। এসব কারণে আর বিশেষত নানা দেশে বিস্তৃত নদী নিয়ে যে সব আন্তর্জাতিক আইনের কথা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা পরিষ্কার যে 'নদী সংযুক্তিকরণ' নিয়ে আদালতের আদেশ পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

সে যাই হোক, আসল কথা হলো ভারতের জল সমস্যার সমাধান করা যাবে কী ভাবে। পরিকল্পনা কমিশনের দশম পরিকল্পনার দলিলে বলা হয়েছে, ৩৮৩টি বড় ও মাঝারি প্রকল্প সমাপ্তির অপেক্ষায়। এর মধ্যে ১১১টি চলছে ২৬ বছরের বেশি সময় ধরে। এই সব প্রকল্পগুলিকে যদি ৫-৮ বছরের মধ্যে সমাপ্ত করা যায়— তাতে দশম পরিকল্পনার টাস্ক ফোর্সের হিসেব অনুযায়ী ১০০,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪ কোটি হেক্টর জমিতে জল দেওয়া যাবে।

পরিকল্পনায় যে দ্বিতীয় বিষয়টি আছে সেটি হলো ক্ষুদ্র সেচের বিকাশ। বিশেষত পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে। এর মোট ক্ষমতা ২.৪৫ কোটি হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া, ৫৪,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে। এর মধ্যে সরকার দেবে মাত্র ১৩,৫০০ কোটি টাকা। বাকি টাকাটা আসবে এই সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক ও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ থেকে। এতে হেক্টর প্রতি সেচের ব্যয় হবে মাত্র ২০ হাজার টাকা, আর মোটেই অপেক্ষা করতে হবে না। সেখানে বড় ও মাঝারি প্রকল্পগুলিতে ব্যয় হয় হেক্টর প্রতি ১ লক্ষ টাকা আর অপেক্ষা করতে হয় গড়ে ১২ বছর। তৃতীয়ত, পরিকল্পনায় যে তৃতীয় একই ধরনের উপকারী প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে তা হলো ভূগর্ভস্থ জল নবীকরণের মাস্টার প্ল্যান। এটি তৈরি করেছে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড। এতে ২৪,৫০০ কোটি টাকা লাগবে প্রতিবছর ৩৬০০ কোটি কিউবিক মিটার জল পেতে। এই সব পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে নদী সংযুক্তিকরণের চেয়ে ভালো। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে বলা চলে বিজ্ঞান পত্রিকা 'নিউ সায়েন্টিস্ট'-এর ভাষায় 'পৃথিবীর জলের লাইনগুলিকে নতুন করে বসানো'।

নদীরা ভূপৃষ্ঠকে রূপ দেয়, তার সদা চলমান বহমান জল রূপ দেয় মানুষের জীবনকে। এই চলমানতা, এই সম্পর্ককে ভাঙলে পরিবর্তনের নানা অনিয়ন্ত্রিত শক্তিকে বোতল থেকে বের করা হবে, 'চাওয়া হয়নি এমন সব ফল' ডেকে আনা হবে। সাইবেরিয়ার দুটি নদীকে আরল সাগরে ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলে কীরকম বিপর্যয় ঘটেছিল তার কথা একবার মনে করা যাক।

জলসংকট যদি সদাসর্বদা একটা প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়, তার কি এর চেয়ে ভালো উত্তর সম্ভব নয়?

www.thecitizen.in থেকে নেওয়া

বিজ্ঞপ্তি

অনীক-এর গ্রাহকদের অনুরোধ,
বকেয়া চাঁদা দ্রুত পরিশোধ করুন।

প্রবন্ধ

মার্কেজ-এর রাজনীতি বিষয়ক একটি দুটি কথা

সুনন্দন চক্রবর্তী

৯ এপ্রিল, ১৯৪৮। বোগোতায় আততায়ীয় গুলিতে নিহত হলেন হোর্খে এলিয়েসের গাইতান। মার্কেজ বলেছেন, এটি কলোম্বিয়ার ইতিহাস দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুহূর্ত। দীর্ঘদিনের রক্ষণশীল সরকার অজস্র নৃশংস রক্তপাত করেছে কলোম্বিয়ায়। তার মধ্যে ১৯২৮-এ ধর্মঘটি কলা-শ্রমিকদের গণহত্যা ঘটে যখন মার্কেজ-এর বয়স ছমাস, বা মতান্তরে দেড় বছর। তাঁর স্মৃতিতে এই গণহত্যা এক অমোঘ উপস্থিতি। এই গণহত্যার যথাযথ তদন্তর দাবি থেকে উদারপন্থী গাইতান সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, এবং ১৯৪৭-র নির্বাচনের পর তাঁর দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। রক্তপাতে ক্লান্ত কলোম্বিয়া যখন গাইতানের আশায় বুক বাঁধছে ঠিক তখনই ঘটে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড। জনরোষে আততায়ীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মার্কেজ তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে একজন সুবেশ লোককে দেখেছিলেন যে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলে পরিচালিত করছিল সৈন্যদের হেফাজত থেকে সন্ত্রস্ত্র সেই ঘাতককে ছিনিয়ে আনতে। ঘাতক খুন হওয়ার পর সে একটি দামী গাড়িতে চড়ে উধাও হয়ে যায়। কেউ তাকে মনে রাখেনি। এমনকি মার্কেজ-এর মন থেকেও সে হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক পরে স্মৃতি পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর মনে এই লোকটির স্মৃতি ফিরে আসে।[১] স্বপ্নভঙ্গের হতাশা এক উন্মত্ত তাণ্ডবের চেহারা নিয়ে তিনদিন বোগোতা-র বুকে প্রেতনৃত্য করে। জনতার রোষ নির্দিষ্ট অভিমুখে ধাবিত না হয়ে নির্বিচার লুঠপাট এবং হত্যা-য় মেতে ওঠে। শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে রক্ষনশীল সরকারের সৈন্যবাহিনী প্রথমে নির্মমভাবে এই দাঙ্গাকে দমন করে। সারা দেশেই তারপর নেমে আসে কঠোর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। মার্কেজ-এর বয়স তখন কুড়ি। সিপাকুরা-র স্কুলে পড়াকালীন মার্কেজ-এর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন একদল তরুণ যাঁরা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যুদ্ধের অক্লান্ত সৈনিক। নিজেদের সংগ্রহ থেকে ছাত্রদের তাঁরা অকাতরে বিলোতেন মার্কসবাদী সাহিত্য। মার্কেজ স্মৃতিচারণ করছেন এই সব বই চালাচালি-র কথা আর বলেছেন এর ফলেই হয়তো রাজনৈতিক বিকৃতির রসায়নাগার বলে স্কুলটি-র বদনাম রটেছিল। কিন্তু তাঁর প্রায় অর্ধেক জীবন পার করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এটা হয়তো ছিল একটা স্বতঃস্ফূর্ত পরীক্ষা— দুর্বলদের ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে আর শক্তিমানদের চিরকালের জন্য গোঁড়ামির বিরুদ্ধে টিকাকরণের জন্যে।[২] এই কুড়ি বছরের মার্কেজ তখনও মোটের ওপর সমাজতন্ত্র চাওয়া এক উদারপন্থী যুবক, ঘটনাক্রম যাকে বিহ্বল করে দিয়েছে। ‘পেয়ারা-র সুগন্ধ’ নামে তাঁর বন্ধু প্লিনিও আপুলেইও মেন্দোসা-র সঙ্গে তাঁর যে দীর্ঘ কথোপকথন সেখানে তিনি মেন্দোসা-র এক প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন যে কমিউনিস্টদের একটা সেল-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল সামান্য কিছুদিনের জন্য। তখন তাঁর বয়স কুড়ি। তেমন উৎসাহব্যঞ্জক কিছু করেননি। তাদের সঙ্গে তাঁর ঘনঘন ঠোকাঠুকি হত এবং তাদের সংবাদপত্রগুলি ওঁর পেছনে উঠেপড়ে লাগলেও তিনি জনসমক্ষে কখনও খোলাখুলি তাদের বিরোধিতা করেননি।[৩] তাঁর দুটি স্মৃতিচারণে সামান্য ফারাক আছে। ‘লিভিং টু টেল দ্য টেইল’-এ ঐ ১৯৪৮-এর নিষ্ঠুর এপ্রিলের তিনদিনের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কেজ কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন তা থেকে মনে হয় তখন পর্যন্ত মার্কেজ-এর সঙ্গে তাদের কোনও সক্রিয় যোগাযোগ ছিল না। গাইতান হত্যা পরবর্তী সেই মতিচ্ছন্ন হিংস্রতার পর্বে, মার্কেজ বলেছেন—

> বাস্তবে একমাত্র যারা কোনও রাজনৈতিক বোধ-এর সঙ্গে কাজ করছিল তারা হল কমিউনিস্টরা, সংখ্যালঘু একদল গোঁড়া, রাস্তার বিশৃঙ্খলার মধ্যে যাদের দেখা যাচ্ছিল জনতাকে চালিত করছে— ট্রাফিক পুলিশের মতো— ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির দিকে।[৪]

এই মন্তব্য থেকে মনে হয় না ঠিক এই সময়ে উনি কোনও কমিউনিস্ট সেল-এর সদস্য ছিলেন। বস্তুত, পঞ্চান্ন বছর বয়সে পৌঁছে মেন্দোসার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে খুবই খোলামেলা ভাবে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের কথা বলেছেন মার্কেজ। জানিয়েছেন যে তিনি মূলত সমাজতন্ত্রের পক্ষে। তিনি বিশ্বাস করেন, আজ হোক কাল হোক, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক হবেই। আর তারই সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে জানিয়ে দেন যে তবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য সীমাবদ্ধ। লেখকের বিপ্লবী দায়িত্ব হল ভাল লেখা।[৫]

তাঁর নোবেল প্রাপ্তির বক্তৃতাতেও মার্কেজ বলেছেন:

> নিজেদের বাস্তবতাকে বিদেশি সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আমাদের আরো বেশি অজানা, আরো কম স্বাধীন, আরো বেশি নিঃসঙ্গ করে তোলে।[৬]

দেখা যাচ্ছে অন্তত দুটি কারণ আছে তাঁর সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার গদ্যশৈলী না-পছন্দ হওয়ার। প্রথমত, এটিকে উনি একটি সীমাবদ্ধ গদ্য প্রকৌশল বলে মনে করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি দাবি করছেন যে লাতিন আমেরিকা-র বিশেষ ঐতিহাসিক খুঁটিনাটি বিস্মৃত না হয়েই একমাত্র সেখানকার বাস্তবতাকে অনুধাবন করা যেতে পারে।

মার্কেজ-এর এই অবস্থান নিয়ে কট্টর মার্কসবাদীরা সুখী

হননি। যেমন তাঁরা প্রীত হননি পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণের ধারাবাহিক বৃত্তান্তে মার্কেজ যখন বলছিলেন, তাঁর মতে সেখানকার সমাজতন্ত্র সেখানকার মানুষদের ওপর জোর করে চাপানো একটা সমাজতন্ত্র, সে সব জায়গার মানুষজনের ইচ্ছেকে পাত্তা না দিয়ে তৈরি করা একটা ধাঁচা। পরিণত বয়সেও তাঁর এই অবলোকন-এর যাথার্থ্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু খুঁটিনাটি-র দিকে তাঁর সত্যিই এমন জ্ঞান যে বন্ধুবর মেন্দোসা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় রুশ আক্রমণ সম্পর্কে ফিদেল কাস্ত্রোর অবস্থানের সঙ্গে তাঁর অবস্থানের পার্থক্য থাকায় বিদেশ বা কুবা-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ থাকছে কী করে তখন উত্তরে তিনি মনে করিয়ে দেন যে একটি ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলেও বন্ধুত্ব বজায় থাকতে পারে। মনে করিয়ে দেন যে চেকোস্লোভাকিয়া-র বাস্তব সম্পর্কে ফিদেল-এর নিরীক্ষা তাঁর নিরীক্ষার থেকেও তীক্ষ্ণ। আর কুবা-র বিশেষ ঐতিহাসিকতা হলো মার্কিন আগ্রাসনের কারণে সেখানে সবসময়েই এক জরুরি অবস্থার মধ্যে বাস করতে হয়।

কথকতা-র শৈলী নিয়ে বিতর্কটি আরেকটু জটিল। তাঁর সবচেয়ে বেশি পঠিত এবং আলোচিত উপন্যাস 'একশো বছরের নিঃসঙ্গতা' থেকে একটা বড় টুকরো নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলে একটু সুবিধে হতে পারে।

> অরেলিয়ানো হেনেরিলন্দো মার্কেজ-এর বাড়িতে ঢুকে স্বভাবসিদ্ধ বাকসংক্ষিপ্তির সঙ্গে এক মগ চিনি ছাড়া কফি চাইল। যখন রান্নাঘরে শুধু তারা দুজন রইলো তখন অরেলিয়ানো গলায় এমন এক কর্তৃত্বের সুর আনল যা আর কখনও শোনা যায়নি। 'ছেলেদের তৈরি করো, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি।' হেরিনেলদো মার্কেজ-এর বিশ্বাস হলো না।
>
> 'কোন হাতিয়ার নিয়ে?'
>
> 'ওদের হাতিয়ার।'
>
> মঙ্গলবার রাতে এক পাগলা অভিযান-এ অরেলিয়ানো বুয়েনদিয়ার নেতৃত্বে একুশজন তিরিশেরও কমবয়েসি ছেলে ছুরি আর ছুঁচলো কিছু হাতিয়ার সম্বল করে আচমকা আক্রমণে সামরিক ছাউনি দখল করে সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল আর ছাউনির উঠোনে ক্যাপ্টেন আর যে চারজন সৈন্য মেয়েটিকে মেরেছিল তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকর করল।
>
> সেই রাতেই যখন ফায়ারিং স্কোয়াড-এর আওয়াজ বন্ধ হয়নি অরেলিয়ানোকে শহরের সামরিক এবং নাগরিক নেতা ঘোষণা করা হল। বিয়ে হয়ে যাওয়া বিদ্রোহীরা তাদের বৌদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ারই প্রায় সময় পেল না। নিজেদের ভরসায়-ই তাদের ছেড়ে তারা বেরিয়ে পড়লো এভাবে। বিপ্লবী জেনারেল ভিক্তোরিও মেদিনা-র সঙ্গে যোগ দিতে চলল তারা, দুপাশে বাহবা দিল লোকেরা যাদের তারা স্বাধীন করেছে। খবর অনুযায়ী জেনারেল তখন মানাউরের পথে। যাওয়ার আগে অরেলিয়ানো কাপড়ের আলমারির মধ্যে লুকিয়ে থাকা দোন মোসকোত আপলিনারকে বের করে আনল। 'ভয় নেই, শ্বশুর মশাই,' বলল তাকে, 'নতুন সরকার গ্যারান্টি দিচ্ছে আপনার আর আপনার পরিবারের নিরাপত্তার। দোন মোসকোত আপেলিনার-এর বেশ কষ্ট হল কাল যে লোকটার সঙ্গে নটা অবধি পাশা খেলেছে তার সঙ্গে এই কাঁধে রাইফেল, উঁচু বুট পরা ষড়যন্ত্রীকে মেলাতে।
>
> 'এ তো পাগলামি, অরেলিতো।
>
> 'পাগলামি নয়, যুদ্ধ', অরেলিয়ানো বলল, 'আর আমাকে আর অরেলিতো বলে ডাকবেন না। এখন আমি কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েনদিয়া।' ৭

এর পরের পরিচ্ছদে আমরা জানতে পারব কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েনদিয়া পঁয়ত্রিশটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছিলেন এবং প্রত্যেকটিতে পরাজিত হয়েছিলেন। সতের জন বিভিন্ন নারীর গর্ভে তাঁর সতেরটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল আর তার মধ্যে সবচেয়ে বড়োটি পঁয়ত্রিশে পৌঁছবার আগেই এক রাতে তাদের পরপর হত্যা করা হয়। চোদ্দটি জীবননাশের প্রচেষ্টা, তিয়াত্তরটি অতর্কিত হামলা এবং একটি ফায়ারিং স্কোয়াডের হাত থেকে তিনি বেঁচে যান। একটি ঘোড়া মেরে ফেলতে পারে এতখানি স্ট্রিকনাইন একবার তাঁর কফিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাও উনি মারা যাননি।

আর এভাবেই প্রথমে যা শুরু হয়েছিল প্রায় এক সাদামাটা ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে, তা আমাদের একটু একটু করে ঠেলে নিয়ে চলে এক অতিকাহিনীর সীমান্তের দিকে যা পার হওয়া মাত্র মুছে যায় সম্ভব-অসম্ভব-এর সীমারেখা। আর আমাদের রোজকার জীবন হয়ে ওঠে জাদুকরী অস্তিত্ব যেখানে খেলার নিয়মগুলো ঠিক হয় আমাদের বাসনা-আর্তি-সংরাগ-এর তীব্রতা থেকে, মাটি-পৃথিবীর বাস্তবতাকে কলা দেখিয়ে। কর্নেল মাকেন্দো শহরকে যার জিম্মায় রেখে যান, সেই হোসে আর্মোদিয়ার খ্যাপামিগুলো প্রথমে থাকে নিতান্তই মজার। তারপর ক্রমশ সেগুলো স্বৈরাচারী বালখিল্যতার দিকে এগিয়ে যায়। উরসুলা চাবুক হাতে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে থেকে দোন মোসকোত আপোলিনার-কে উদ্ধার না করা পর্যন্ত চলে নতুন শাসকের খ্যাপামি।

একদিক থেকে এই চিত্রনাট্য আমাদের চেনা। কতবার আমরা দেখেছি ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নতুন শাসক অল্পে অল্পে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে সামাজিক ন্যায়ের বোধ থেকে।

মার্কেজের রাজনৈতিক দর্শন দুটি মূল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক, একটি বিশ্বজনীন সামাজিক ন্যায়ের ধারণা। দুই, যে কোনো প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তির খ্যাপামির অধিকার, অবশ্যই তা যদি সামাজিক ন্যায়কে ক্ষুণ্ণ না করে।

এর পর ১৯ পৃষ্ঠায়

স্মৃতিচারণ

আমার কালের কথা

বনবিহারী চক্রবর্তী

গত ১৪ এপ্রিল ২০১৪ ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক একনিষ্ঠ কর্মী ও তাত্ত্বিক বনবিহারী চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। আত্মপ্রচারে বিমুখ, আক্ষরিক অর্থেই পণ্ডিত, অনুশীলন ও তত্ত্বের যুগলবন্দীতে লিপ্ত এই মানুষটি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন ৯০-এর দশক থেকে। বহু আলাপ আলোচনার পর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছিলেন এই অলিখিত শর্তে যে ঘটনাক্রম এবং ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তায় তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে দেখা বিষয়টি বলবেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার চোরাগলি এড়িয়ে যে সমস্ত ঘটনায় তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিলো, ইতিহাসের সেই অংশটি বর্ণনায় তাঁর অনিবার্য উপস্থিতি উপেক্ষা করা অসম্ভব। প্রায় দু বছর ধরে তিনি আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি যতটুকু অনুমোদন করেন, ততটুকু আমরা এখানে প্রকাশ করছি।

ছোটোবেলায় আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ে শিখেছিলাম ব্যক্তি হিসেবে কী ভাবে নিজেকে আড়াল রাখতে হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠার জন্য, যশ আর নামের জন্য কাঙাল হওয়ার বিষয়টি যে ঠিক নয় তা কমিউনিস্ট হওয়ার আগেই আমার মনে ঢুকে গিয়েছিলো। আমার আমি হয়ে ওঠা ঘটেছে সমসাময়িক কালের ভেতর দিয়ে। তাই সমসাময়িক কালের কথা বলার সময় আমার নিজের অভিজ্ঞতাও এসে যাবে এবং সে সূত্রেই নিজের কথাও বলতে আমি বাধ্য হবো।

আমার জন্ম ১৯২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর। অসহযোগ আন্দোলনের সেই যুগটা ছিলো সত্যিকারের পরিবর্তনের যুগ। ‘পথের পাঁচালী’-র অপুর মতো এক গ্রাম্য বালক আমি গ্রাম ছেড়ে শহরে আসি পাঁচ বছর বয়সে। এসে হাজির হই শ্রীরামপুরে। এখানে আসার পর আমার চোখের সামনে যেন এক নতুন জগৎ খুলে যায়। সেই সময়ের আবহাওয়ায় ছিল বিপ্লবী ঘ্রাণ। হাওয়ায় হাওয়ায় খবর রটে গেল যে ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হবে। ফাঁসি শেষ পর্যন্ত হয়েও গেল, এই ফাঁসির বিষয় নিয়ে শ্রীরামপুর খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সে আবহাওয়ায় শ্রীরামপুরের আরও অনেকের সঙ্গে আমিও দারুণভাবে প্রভাবিত হই।

ঐ অঞ্চলের অনেক মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে উৎসাহ তৈরি হয়। ব্রতচারী আন্দোলন তখন চলছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেও মানুষ অনেক উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এই সব কিছু মিলিয়ে এই সময়টায় এক বড় অংশের মানুষের মধ্যে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা গেল।

এমনই একটা উত্তাল সময়ে আমার সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সংযোগ ঘটে। বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন তখন ‘অনুশীলন’ বিপ্লবী দলের নেতা। আমার ঐ দলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে বিপিন-দার মাধ্যমে। আমি তখন বিপিন-দার বাড়ি প্রতি সপ্তাহে একবার করে যেতাম। তিনিও আমার বাড়ি এসেছেন বহুবার।

শ্রীরামপুরে বছর পাঁচেক কাটানোর পর ১০ বৎসর বয়সে আমি হাওড়ায় এলাম। হাওড়ায় রিপন স্কুলে ক্লাশ ফাইভ-এ ভর্তি হলাম। রোজ বাড়ি থেকে হেঁটে স্কুল যেতাম। স্কুলে যাওয়ার পথে রোজই একজনের সঙ্গে দেখা হতো। তাঁর নাম সুজন সরকার। তিনি একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সদর বক্সি লেন-এ পড়লে তিনি আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে নিজের স্কুলের দিকে হাঁটা দিতেন। অন্য যাঁর সঙ্গে নিয়মিত দেখা হতো তিনি হলেন বিপিনদা।

হাওড়ার খুরুট রোড-এর বর্তমান নাম হয়েছে নেতাজি সুভাষ বসু রোড। সেই খুরুট রোড-এ তখন কালীবাবুর বাজার ছিল। বাজারের কাছেই ছিল একটা মাখনের দোকান। ঐ দোকানে আমি প্রায়ই মাখন কিনতে যেতাম। ঐ দোকানে দেখতাম কয়েকজন বসে নিয়মিত আড্ডা মারে। একদিন ঐ দোকানে মাখন কিনতে গেছি। গিয়ে দেখি তিনজন বসে আড্ডা দিচ্ছে। পরে জেনেছি তাঁরা ছিলেন রবীন সরকার, আর একজন ছিলেন শিল্পী। তৃতীয়জন সুবীর মুখোপাধ্যায়। ইনি শিবনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নে। শিবনাথ মুখোপাধ্যায় মীরাট কমিউনিস্ট মামলার একজন অভিযুক্ত ছিলেন।

একদিন আমি যখন মাখন কিনছি তখন শুনলাম একজন আর একজনকে বলছেন : ছেলেটার গলার দাগটা দেখেছিস। এই কথাটার অর্থ সেসময় ছিল যে গলায় ফাঁসির দড়ির দাগ। অর্থাৎ ছেলেটার মধ্যে বিপ্লবী হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এই ভাবে ফন্দি করে তাঁরা আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন। আমিও পরে এই কায়দায় লোকের সঙ্গে আলাপ করে তাদের বিপ্লবী দলে টেনে এনেছি।

আমার সঙ্গে এইভাবে বিপ্লবী দলের সংযোগ হলো। এঁদের মাধ্যমেই আমার সঙ্গে এক সময় বিপিনদা-র সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে উঠলো। আমরা ঐ অঞ্চলে একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলাম। ক্লাবটির নাম দেওয়া হলো আবর্তন সংঘ। বিপিনদা তখন বিপ্লববাদী যে দলকে পুনর্গঠিত করেছিলেন, আমাদের আবর্তন সংঘ সেই দলের শাখা সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে। এটা ছিল আমাদের প্রকাশ্য কাজকর্মের জায়গা। আমাদের গোপন বিপ্লবী কাজের জন্য ছিলো অন্য একটি সংগঠন। তার নাম ছিল United Socialist Republican Army।

বুড়ি বালামের তীরে বালেশ্বর যুদ্ধের শহিদ চিত্তপ্রিয় আমাদের এই দলের সদস্য ছিলেন। যে বাজারের কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি, সেই বাজারের কাছে ছিলো অমৃত পাইন লেন। তখন ওখানে আমাদের গুপ্ত সংগঠনের ডেরা ছিল। এই ডেরাতে বিপিনদা প্রায় নিয়মিতই আসতেন। সময়টা হবে ১৯৩৩-৩৪ সাল।

আমি আমাদের গুপ্ত সংগঠনের কাজ প্রায় কিছু দেখিনি। এই গুপ্ত সংগঠনের নেতা হিসেবে সুধাংশু মৈত্র আমাকে দিয়ে একটা কাজ করাবেন বললেন। তিনি আমাকে বললেন যে তোমাকে একটা পিস্তল দেওয়া হবে। বার্ন কোম্পানির ইংরেজ ম্যানেজারকে খতম করতে হবে ঐ পিস্তলটা দিয়ে। ঐ ম্যানেজার প্রতিদিন দুপুরবেলা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য তেলকল ঘাট (সে অঞ্চলটার বর্তমান নাম রামকৃষ্ণপুর) পেরিয়ে যায়। আমার কাজ হবে তখন ঐ সাহেবকে গুলি করে হত্যা করা।

এমন এক কাজের কথা শুনে তো আমার কপালে ঘাম জমে গেলো। উনি আমাকে পিস্তলটা দিলেন। পিস্তলটা হাতে পেয়েই আমি এই কাজটা করবো বলে হ্যাঁ বলে দিলাম। তখন আমার এই সমস্ত কাজের পরিণাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। তবে এইটুকু জানতাম কাজ করতে গিয়ে অসফল হয়ে যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে কী হতে পারে। সুধাংশুবাবু আমাকে দু-চারদিন বারবার সাহস দিলেন। তখন আমার নানারকম বিচিত্র অনুভূতি হলো। প্রথমে মনে হলো মা-র কী হবে, মা কী বলবেন ইত্যাদি। আমার মায়ের প্রতি একটু টান ছিল। দুদিন পরে এসেও আমি কাজটা করবো বলে আবার হ্যাঁ বলে দিলাম।

তখন ভগৎ সিং-এর ফাঁসির ঘটনা ঘটে গেছে। আমাদের মধ্যে তখন ভগৎ সিং-এর প্রভাব রয়েছে প্রচুর। ভগৎ সিং-এর অনুপ্রেরণায় এই কাজে হ্যাঁ বলতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর আমাদের কাজ শুরু হলো। সাহেবের যাতায়াতের পথে কিছুদিন দাঁড়িয়ে থেকে সাহেব কখন আসে, কখন যায়, সঙ্গে আর কে থাকে, সাহেবের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন, এই সব খুঁটিনাটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার কাজ চললো। তারপর একসময় অ্যাকশনের দিন স্থির হলো।

আমায় যে পিস্তলটা দেওয়া হয়েছিলো সেটা একটা র‍্যাশন ব্যাগে ভরে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কথা ছিলো যে আমি সাহেবকে গুলি করলেই একটা গাড়ি এসে আমাকে তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। আমি পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়েই আছি। সাহেব আসার সময় পার হয়ে গেলো কিন্তু সাহেব আর সেদিন এলো না। একটা গাড়ি এসে যথাসময়ে আমাকে তুলে নিয়ে গেলো। তখন বুঝলাম এই অ্যাকশনের পরিকল্পনাটা আসলে ছিলো বিপ্লবী জীবনে আমার প্রবেশের পরীক্ষা। সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে আমি পরীক্ষায় উতরে গেলাম।

এইভাবে বিপ্লবী দলে গৃহীত হওয়ার পর বিপ্লবী দলের অনুশীলনের সঙ্গে আমি আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলাম। প্রথমেই আমাকে অনেক কটা ক্লাস করতে হলো। এর মধ্যে প্রথম ক্লাসটা নেন বিপ্লবী শ্রী তিনকড়ি গাঙ্গুলী। যতদূর মনে পড়ছে ক্লাসগুলো হয়েছিলো পার্ক সার্কাস অঞ্চলে পাম এভিনিউ-এর একটা বাড়িতে। তিনকড়িবাবু বোধহয় খান তিনেক ক্লাস নিয়েছিলেন। তিনি মূলত আত্মগোপন করার মূল কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই ক্লাসগুলো করেই আমার সারা জীবনের আত্মগোপন করে থাকার শিক্ষা হয়ে যায়। ১৯৪৮ সাল থেকে সেই সিপিআই(এমএল)-এর সময় পর্যন্ত আমি প্রায় একটানা আত্মগোপনের জীবনে কাটিয়েছি একবারও পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে। এর পেছনে তিনকড়িবাবুর সেদিনের শিক্ষা খুব কাজে লেগেছে।

তারপরে আরও কয়েকবার বসা হয়। সুধাংশুবাবু আমাকে আর একটা কাজ করার ভার দিয়েছিলেন। তিনি বললেন যে হাওড়া অঞ্চলের একটা বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি করতে হবে— বিশেষত পুলিশ তাড়া করলে যাতে গলি দিয়ে পালানো যায়, সেই জন্য হাওড়ার সব গলির ভূগোল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বাড়াতে হবে। পালানোর জন্য উপযুক্ত সেইসব গলির খবর আমি বার করেছিলাম। কিন্তু তখন আমার হাওড়ার ভূগোল সংক্রান্ত জ্ঞান বিশেষ কাজে লাগেনি। পরে ১৯৪৮ সালে আমাকে যখন আত্মগোপন করতে হলো তখন পুলিশ তাড়া করলে আমি আমার হাওড়ার গলি সম্পর্কিত তখনকার অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ম্যাজিকের মতো উবে যেতে পারতাম। খানিকটা তখনকার অর্জিত নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আর খানিকটা তিনকড়িবাবুর শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আমি আমার আত্মগোপন জীবন অতিবাহিত করেছি। ১৯৪৮-এ যাঁরা ধরা পড়েছিলেন, তাঁরা প্রায় কেউই আত্মগোপন জীবনের মূল সূত্রগুলো একেবারেই পালন করতেন না। তাঁরা প্রায় নিয়মিত চা-এর দোকানে গিয়ে বসতেন, গল্প করতেন। সেই সব গল্পের অধিকাংশই ছিলো তাঁরা কেমন ধরনের এ্যাডভেঞ্চারের কাজের সঙ্গে যুক্ত, কেমনভাবে তাঁরা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ইত্যাদি। যুবক-ছাত্রদের তাঁদের বিপ্লবী গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং দরদী তৈরি করার তাগিদ থেকে তাঁরা তাঁদের নিজেদের অজান্তেই নিজেদের বিপ্লবী পরিচয় প্রকাশ করে দিতেন। ফলে তাঁরা তো গ্রেপ্তার হতেনই, সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষুদ্র দরদী গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠার সম্ভাবনাগুলো তৈরি হচ্ছিল সে সম্ভাবনাও শেষ হয়ে যেত। এই সব কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁরা শেষ বিচারে শত্রুর সম্মুখে সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকট করে তুলতেন এবং তাঁদের গ্রেপ্তার গড়পড়তা কর্মীদের মনোবল কমিয়ে তাদের হতোদ্যম এবং শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের পথ রুদ্ধ করে তুলত।

আমি তখন বিপিনদার কাছে নিয়মিত যেতাম। কিসের আকর্ষণে যেতাম এখন আর সেটা মনে করতে পারছি না। বিপিনদার বাড়ি আর দপ্তর ছিলো খুব কাছাকাছি। ৪ নম্বর ফরডাইস লেনে ছিলো দপ্তর আর ১০ নম্বর ফরডাইস লেনে ছিল তাঁর বাড়ি। আমি ৪ নম্বরে গিয়ে বসে থাকতাম। উনি যেমন যেমন কাজ করতে বলতেন সেই সব কাজ করার চেষ্টা করতাম। আমি ওনার জন্য লাইব্রেরি থেকে বই এনে দিতাম। কোনো কোনো নেতার সঙ্গে তিনি আমার মাধ্যমে চিঠি চালাচালি করতেন। এরকম একজন নেতা ছিলেন 'দেঁতো কালী'। তাঁর আসল নামটা তখনই বিশেষ কেউ ব্যবহার করতেন না। সুভাষ বসু বিপিনদা-র সঙ্গে আলোচনা করার জন্য দুদিন ৪ নম্বরের ঘরে এসেছেন। আমি বসে সেই সব আলোচনা শুনতাম। আলোচনার বিষয় এখন মনে পড়ে না। তবে উনি একদিন ৪-৫ জন লোক নিয়ে এসেছিলেন। বললেন এরা গ্রাম থেকে এসেছে, এদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বিপিনদা আমাকে এদের খাওয়ানোর ভার দিলেন। তখন চৌকো দুই আনা পাওয়া যেত। সেই দু-আনায় সে সময়ে একজন গ্রামের মানুষের একবেলা পেটভরে খাওয়া যেত। আট আনায় চারজনকে খাইয়ে দিলাম। সেই সময় নানা রকম রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। বিপিনদা তখন গান্ধীর দিকে ঝুঁকছেন। আমার সঙ্গে বিপিন-দার মতভেদ শুরু হলো। আগস্ট আন্দোলনে কেমন ভাবে যোগ দেওয়া যায় তা নিয়েও বিতর্ক বেঁধে ওঠে। আমি ঠিক করলাম আগস্ট আন্দোলনে যোগ দেবো, কিন্তু গান্ধীবাদীরা যেভাবে যোগ দিতে চাইছে ঠিক সেই ভাবে যোগ দেওয়া আমার পছন্দ ছিলো না। এই নিয়েও বিপিনদা-র সঙ্গে আমার মতপার্থক্য ছিল।

এর মধ্যে ১৯৩৯ সাল চলে এলো। যুদ্ধ শুরু হলো। এই সময় একদিন বিপিনদা-র সঙ্গে কমিউনিজম নিয়ে আলোচনা হলো। খানিকটা বিতর্কের পর উনি বললেন যে সাধারণভাবে কমিউনিস্টরা ভালো, কিন্তু এদেশের কমিউনিস্টদের দিয়ে বিপ্লব হবে না। এরা সশস্ত্র বিষয়ে খুব ভীত। এদের হাতে পিস্তল পড়লে এরা ভয় পেয়ে গিয়ে কাপড় নোংরা করে ফেলবে!

বিপিনদা তো গান্ধীবাদী বনে গেলেন। এই বিষয়টি নিয়ে একদিন আমি বিপিনদার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করলাম। উনি কিন্তু আমার সঙ্গে আগাগোড়াই স্নেহভরে কথা চালিয়ে গেলেন। আলোচনার শেষে উনি আমায় বললেন যে আমি জনগণের স্বার্থেই গান্ধীবাদী হয়েছি।

যুদ্ধ লেগে যাওয়াতে আমি দুটো চাপের মুখে পরে গেলাম। কলকাতা আর তার আশপাশে জাপানি বোমা পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যে আমার বাবার রেলের দপ্তর কাশীতে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। (আমার বাবা তখন রেলে চাকরি করতেন)। ফলে আমাকে হাওড়া ছাড়তে হলো। আমার মাথায় তখন আগস্ট আন্দোলন ঘুরছে। তখন নানান পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সব পুস্তিকায় গেরিলা যুদ্ধের কথা থাকছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলী প্রমুখ কেউ কেউ ইংরেজ শাসকদের ব্যতিব্যস্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে গিয়ে এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটলো। প্রায় কাছাকাছি সময়ে আমার সঙ্গে অচ্যুত পটবর্ধনের পরিচয় হয়। তবে এই যোগাযোগ বেশিদিন টেকেনি।

এই সময়ে আমি নিজে একটি গোষ্ঠী গঠন করি। সেই গোষ্ঠীতে ১২ জন তরতাজা যুবক ছিলো। এদের মধ্যে ১০ জন বাঙালি আর ২ জন অবাঙালি। আমরা জয়প্রকাশের ধাঁচে কিছু কিছু স্যাবোটেজ জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করি। আমরা কয়েকজন পাহারাদার দারোয়ানের বন্দুক ছিনতাই করি। এই জাতীয় কাজ আমরা প্রায় মাসখানেক ধরে চালিয়ে যাই।

এমন সময় আমাদের কয়েকজন বন্ধু, যার সঙ্গে আমি রাত্রিতে থাকতাম, সে খবর আনলো যে একজন কমিউনিস্ট নেতা, রুস্তম সাটিন আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমরা রুস্তমের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। আলোচনা চললো দু দিন ধরে। রুস্তম জনযুদ্ধ-র তত্ত্ব বোঝালেন। বললেন এই যুদ্ধে কেন সোভিয়েত-কে সমর্থন করতে হবে। আমরা রুস্তমের কথায় ভেসে যাই এবং জনযুদ্ধের তত্ত্বকে মেনে নিই। আমাদের মনে হলো, রুস্তমও আমাদের সেরকমই বুঝিয়েছিলেন যে এই যুদ্ধে সোভিয়েত-কে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে হলে আমাদের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া প্রয়োজন।

আমরা পাঁচজন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে গেলাম, নির্বাচিতও হলাম। আমি লখনউ-তে বিমান বাহিনী বিভাগে যোগ দিলাম। এই বাহিনীর একজন ডাক্তার আমাকে বললেন যে তুমি নিশ্চয় বাড়ি থেকে পালিয়ে সেনাবাহিনীতে এসেছো। তোমাকে আমি মেডিক্যালি আনফিট করে দিচ্ছি। ডাক্তারটি বাঙালি ছিলেন। পরে ওনার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি তো আমাকে মেডিক্যালি আনফিট করে দিলেন। আমি ওনার বাড়িতে প্রায় এক সপ্তাহ থেকে একদিন কানপুরে পালিয়ে এলাম।

রুস্তম আমাদের বোঝালেন যে আমাদের বিপ্লব করতেই হবে। আর বিপ্লব শুরু হলে সৈন্যবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। সেই অস্ত্রধারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়ার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। তাই অস্ত্র চালানো শেখা, অস্ত্রধারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের শেখা দরকার। এছাড়াও, বিপ্লব শুরু হলে সেনাবাহিনী যাতে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দ্বিধান্বিত হয় সেই ব্যবস্থাও করা দরকার। সেনা যদি বিপ্লবে আমাদের সঙ্গে আসে তো তা আরও ভালো। এর জন্য প্রয়োজন সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ। এই প্রতিটি উদ্দেশ্য সফল হতে পারে যদি কমিউনিস্টরা বড় আকারে সেনাবাহিনীতে যোগ

দেয়। এখন যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের সেনাবাহিনীতে অত বাছবিচার করে লোক নেওয়ার সময় নেই। অনেক কমিউনিস্টকেও এখন সেনাবাহিনীতে নিচ্ছে। কমিউনিস্টরা জনযুদ্ধের ডাক দেওয়াতে তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে গেছে। কমিউনিস্টদের এখন তাই সত্যিকারের যুদ্ধ শেখার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ করতে উস্কানি দেওয়ার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া দরকার। আমরা রুস্তমের এই যুক্তি মেনে নিই এবং সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সময়টা ১৯৪৩ সাল। সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আমরা ১০ জন গিয়েছিলাম। সেই দশ জনের মধ্যে মাত্র একজন পালিয়ে যায়, অনিল দত্ত। বাকি ৯ জন আমরা সেনাবাহিনীতে থেকে গেলাম। সেনাবাহিনী থেকে আমরা যে খুব কিছু যুদ্ধ, অস্ত্র-চালানো শিখলাম এমনটা নয়। তবে এখানে থেকেই আমাদের প্রাথমিক স্তরের বন্দুক চালানোর শিক্ষা হয়।

বড় বড় সাতটা অস্ত্রসম্ভারের ডিপোতে আমার ডিউটি ছিল। সেখানে ওই সমস্ত অস্ত্র-র বিভিন্ন অংশ খোলা আর জোড়া লাগানোর অভিজ্ঞতা হয়। এই ডিপো ছিল ডিরেক্টর অফ অর্ডিন্যান্স-এর আওতায়। এই ডিপো থেকে আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র সরবরাহ করা হতো। পার্টি যদি বিপ্লব চাইতো তবে সেই সময় অনেক কিছুই করা যেত। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে পার্টি-র যা সংগঠন ছিল তাতে সেই সময়ে বিপ্লব করা একেবারেই অবাস্তব ছিল। কিন্তু বড়ো মাপের বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান হলেও হতে পারত। পার্টি এমনকি নৌবিদ্রোহের ধাঁচেও কিছু করেনি, যদিও আমাদের মাধ্যমে প্রায় ঐ জাতীয় কিছু করার জন্যেই রুস্তম আমাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সেই সময়ে যোশীর লাইন-ও প্রায় এরকমই ছিল। কিন্তু সেই সময় থেকেই পার্টির শাসক দলের লেজুরবৃত্তি করা শুরু হয়ে যায়। তখন পার্টির গান্ধীর পায়ে আত্মসমর্পণ করার লাইন এসে গেছে।

অস্ত্র কোথা থেকে কোথায় যাবে সে খবর আমার কাছে থাকতো, আমিই সেই সব নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে অস্ত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম। অন্য অনেক বিষয়ে ডিওএস বা ডিরেক্টরেট অফ অর্ডিন্যান্স সাপ্লাই, ওয়ার ডিভিশন, হেড কোয়ার্টার্স, আমার সঙ্গে পরামর্শ করতো, ফলে আমি অনেক গোপন এবং বাড়তি তথ্য জানতে পারতাম। আমার পদটা ছিল সুপারভাইসরি গোত্রের, তাই আমি সিভিলিয়ান হওয়া সত্ত্বেও ওরা বিভিন্ন বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ বা আলোচনা করতো। ডিওএস-এর তাই ছিলো নির্দেশ। এই ডিপোতে একজন জার্মান অফিসার ছিলেন যাকে কোনো ব্রিটিশ অফিসার সহ্য করতে পারতো না। আমার ঠিক ওপরের অফিসার ছিলো ল্যাটিন সাহেব। জার্মান অফিসার বললো যে আমাকে সই-এর জন্য ল্যাটিন সাহেবের কাছে যেতে হবে। ল্যাটিন সেই জার্মানকে গালাগাল দিয়ে বললো যে আমার নিজের সইতেই জার্মানকে কাজ করতে হবে, ল্যাটিন কোনো সই করবে না।

আমার কমিউনিস্ট পার্টিতে আসা

আমরা নিজেরাই অনুশীলন করতে করতে যোশীর সংশোধনবাদের বিষয়টি বুঝতে শুরু করি। যোশী নিজে ছিলেন জমিদারশ্রেণীর। তৎকালীন একজন বড় জোতদার এবং কংগ্রেসী মন্ত্রী-র ভাগ্নে ছিলেন যোশী। সেই সময়ের আর একজন বড়ো কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন সাপুরজি। তিনি টাটা পরিবারের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তিনি অসম্ভব সুন্দর বক্তা ছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, সেই সময়কার এআইটিউসি-র নেতা ছিলেন মৃণালকান্তি বসু। সাপুরজি তাঁকে বলেছিলেন যে দেখো, আমি শ্রমিক আন্দোলন করবো বলেই অনেক ভেবে চিন্তে টাকা সঞ্চয় করেছি। ইংল্যান্ডে বাড়িও করেছি। খাওয়া-পরার সব ব্যবস্থা করে তবে আমি কমিউনিস্ট হয়েছি।

তখন আর একজন ছিলেন ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে, তাঁর নাম কিশোরীলাল ঘোষ। ইনি খুব সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন কিন্তু কমিউনিস্ট ছিলেন না। লন্ডন থেকে সিপিজিপি-র চিঠি বা ইংল্যান্ড থেকে সিপিজিবি-র পক্ষ থেকে পাঠানো কমরেডরা এনার কাছেই উঠতেন। ফিলিপ স্প্র্যাট-এর চিঠি এনার কাছেই আসত।

এই কিশোরীবাবু সম্পূর্ণ অন্য ধাতুর মানুষ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখিনি। তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। কিশোরীবাবু মীরাট মামলার একজন অভিযুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কমিউনিস্ট মনে করেই অভিযুক্ত করে। তাঁর একটি কথা সেসময়ে কিম্বদন্তি হয়ে উঠেছিলো। তিনি বলতেন : দিনের বেলায় ওকালতি-সাংবাদিকতা, আবার অন্য সময়ে বিপ্লবী কাজ করলে বিপ্লব হয় না। শ্রমিক এলাকায় গিয়ে বক্তৃতা করে চলে এলেও কিছু হবে না। শ্রমিকদের মধ্যে থাকতে হবে। শ্রমিক মহল্লায় লেগে পড়ে থেকে অগ্রগামীর ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বাউড়িয়া অঞ্চলে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করতেন।

তারপর কাশী থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে, লোহতা অ্যামুনিশন ডিপো-তে যোগ দিই। সৈন্যবাহিনীতে আমার পদ ছিলো ইটিই বা extra temporary establishment। এই দপ্তরটি যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছিলো। আমি তো খুব খুশি হলাম যে এখন এই যুদ্ধে আরও সক্রিয়ভাবে সোভিয়েত-কে সাহায্য করা যাবে।

রুস্তম সাটিন পরে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মন্ত্রী হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই ছিলো। রাস্তায় কখনও যদি রুস্তমের সঙ্গে দেখা হতো তখন ও আমাকে গাড়িতে উঠে আসার জন্য অনুরোধ করত। আমাকে ও রহস্য করে বলত, লোকে ভাববে আমি বুঝি তোমাকে গ্রেপ্তার করে তুলে নিয়ে

যাচ্ছি! ও আমাদের জনযুদ্ধের লাইনে নিয়ে আসে কিন্তু নিজে সিপিআই-তে রয়ে যায়। অচ্যুত পট্টবর্ধন আমাদের স্যাবোতাজের লাইন দিয়েছিল, বন্দুক ছিনতাই ইত্যাদি বলত, যদিও সে এসব কিছুই করত না। বলত সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করতে। এই কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন আমরা ৫০টা পোস্ট বাক্স খুলে যাবতীয় চিঠিপত্র গঙ্গায় ফেলে দিলাম।

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকায় এই সমস্ত কাজের কোনও প্রভাবই মানুষের মধ্যে পড়েনি— এমনকি এই কাজগুলো যে ব্রিটিশ-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি করছে সে সম্পর্কেও মানুষ সচেতন ছিলো না। নেতারা ওপর থেকে আত্মগত ধারণার ভিত্তিতে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে কর্মপদ্ধতি স্থির করতেন। সেই কর্মপদ্ধতির সঙ্গে বাস্তবের কোনও যোগ ছিলো না। আমরা যে ছোটো গোষ্ঠীটি গঠন করেছিলাম, সেই গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আমাদের আশা ছিলো যে বিপ্লবের কাজে সহায়তা করার জন্য পার্টি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমরা জানতাম, কোন কোন ডিপোতে কী কী অস্ত্র থাকে, কোথায় কোথায় সে অস্ত্র কোন রাস্তা ধরে কোথায় যায়। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের কাছ থেকে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে নিয়ে পার্টি ঐ সমস্ত অস্ত্র ছিনতাই করার পরিকল্পনা করবে। কিন্তু বাস্তবে এসে দেখা গেল পার্টির ঐসব কিছু পরিকল্পনাই নেই। আমরা বৃথাই পার্টি-র নির্দেশের আশায় বসে রইলাম। কোনো নির্দেশ এলো না, এমন কি এই বিষয়ের কোনো আভাস পর্যন্ত এলো না। উল্টে আমরা দেখলাম, পার্টি গান্ধীকে চিঠি লিখে তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করছে। আমাদের অনেকটা মোহভঙ্গ হলো।

ইতিমধ্যে ১৯৪৬ এসে গেল। বম্বে আর করাচিতে নৌবিদ্রোহ শুরু হলো। আমরা তখনও অস্ত্র ডিপোতেই আছি। এই সময়ে সারা ভারত অর্ডিন্যান্স শ্রমিকদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন ছিল। সেই সংগঠনের যে স্থানীয় শাখা, সেখানে আমাদের প্রায় একচ্ছত্র প্রভাব। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা ভারতের অর্ডিন্যান্স শ্রমিকদের আহ্বান করা হলো এই বলে যে তাঁরা যেন নৌবিদ্রোহীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেন। আমাদের ডিপোতে এই ইস্যুতে অত্যন্ত সফল হরতাল হলো। এই হরতাল সফল হওয়ায় আমরা কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়লাম। এই হরতাল সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আমার যে মুখ্য ভূমিকা ছিল, তা আমি জানাজানি হতে দিইনি। আমার সে যাত্রায় তাই শাস্তি হলো না। কিন্তু আমি সন্দেহভাজনদের তালিকায় ঢুকে গেলাম।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে একটি ডিপোতে একটি উড়োজাহাজ থেকে একটি ২৪ পাউন্ড ওজনের শেল ফেলা হয়। এই শেলগুলোর কয়েকটা শেল ফেটে যায় এবং ঐ শেডটি বিস্ফোরণের ধাক্কায় উড়ে যায়। ৭ জন শ্রমিক এই ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। যদিও ঐ ডিপোটি আমার দায়িত্বে ছিলো, কিন্তু বিস্ফোরণের দায় আমার ছিলো না। শেল 'আনসার্ভিসেভল' কিনা, তার থেকে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা আছে কিনা, এই সব কিছু দেখার দায়িত্বে ছিলো একজন সাহেব। এই সাহেবদের বলা হতো অ্যামুনিশন এগজামিনার। তাদের ডিউটি ছিল শেল সার্ভিসেভল কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা। তাই আনসার্ভিসেভল বলে ঘোষিত শেল যদি ফেটে যায় তবে তা ওদের ব্যর্থতা। এই নিয়ে ওদের সঙ্গে আমার বিরোধ চরমে ওঠে। এই ডিপোতে আশপাশের গ্রামের প্রায় হাজার চল্লিশ শ্রমিক কাজ করতেন। বিস্ফোরণের সময় প্রচণ্ড শব্দ হওয়ায় এই শ্রমিকদের অনেকেই জমায়েত হয়ে যায়। অত ভিড় দেখে একজন সাহেব, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ব্লান্ডেল, খুব ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে বলে যে, যে শ্রমিকরা বিস্ফোরণের কারণে মারা গেছে, আমি যেন হাজিরা খাতা থেকে ঐসব শ্রমিকদের নাম কেটে দিই। আমার দাদাও তখন ঐ ডিপোতে চাকরি করে। আমার ওপর একটু চাপ তৈরি হয়। সব কিছু ভেবে আমি আমার ঠিক ওপরের সাহেব অফিসারকে সাফ বলে দিই যে আমি হাজিরা খাতা থেকে ঐ মৃত শ্রমিকদের নাম কিন্তু কাটছি না। অর্থাৎ আমি ব্লান্ডেল সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন আমার ঠিক ওপরের অফিসার বলে যে এই প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমার কোর্ট মার্শাল অবধারিত। ও আমাকে বলল যে এখুনি কাঁটাতার টপকে পালিয়ে যাও। আমি দেখলাম যে আমাকে যখন চলেই যেতে হবে, তখন আমাদের পক্ষে একটু প্রচার করে চলে যাওয়াই ঠিক কাজ। আমি তখন আশপাশের গ্রাম থেকে জমায়েত হওয়া শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দিয়ে মৃত শ্রমিকদের নাম যে হাজিরা খাতা থেকে কেটে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে সে বিষয়টি ফাঁস করে দিই। এই খবর জানাজানি হওয়ার পর পার্টি-র নেতারা ছুটে আসেন। তাঁরা বলেন যে তুমি আমাদের কাছে চলে এসো, তোমার নিরাপত্তার ভার এখন আমাদের। তাঁরা আমাকে পার্টিতে যোগ দিতে বলেন। আমি যদিও নিজেকে পুরোপুরি কমিউনিস্ট-ই ভাবতাম, কিন্তু আমি তখনও পার্টি-সদস্য ছিলাম না। আমার সঙ্গে তখন আইপিটিএ-র নেট-ওয়ার্ক ছিল, তার সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল।

সামরিক বাহিনীতে কাজ করার জন্য যে ধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড সেল করার কথা ছিলো, পার্টি-র তেমন কোনো চেতনা ছিলো না। এমন সংগঠন গড়ার কথা কোনো কোনো নেতা হয়তো ভাবতেন, কিন্তু পার্টির মধ্যে তেমন কোনো সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় এই বিষয়টি আর হয়ে ওঠেনি। সাধারণত ছাত্রদের মধ্যে কাজ, আইপিটিএ, রিলিফ কমিটি, এই জাতীয় কাজের মধ্যেই তখনকার কমিউনিস্ট পার্টির অনুশীলন সীমাবদ্ধ ছিলো। নৌবিদ্রোহের মতো কোনো কিছু ভাবার মতো অবস্থায় পার্টি বা পার্টির নেতারা ছিলেন বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যে বিপিনবাবুর সঙ্গে একদিন আলোচনা হলো। উনি

বললেন আমাদের আর সিপিআই-এর মধ্যে আকাঙ্ক্ষার অনেক তফাৎ। উনি বললেন যদিও শেষ পর্যন্ত আমাদের শ্রমিক আন্দোলন করতেই হবে, কিন্তু সেই আন্দোলন সিপিআই করবে না বলে আমাদের সিপিআই-এর সঙ্গে জুটে গেলে চলবে না।

আমরা military intelligence নিয়ে ভাবতাম। *ভেরা— দ্য নিহিলিস্ট* বইটি খুঁজে বের করে খুঁটিয়ে পড়া হতো। এই পড়া থেকে বিপ্লবী জীবনযাপন, গোপন আন্দোলন সম্পর্কে এক ধরনের অনুশীলন ও শিক্ষা হতো। আমাদের কাছে এলাকার পরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। অর্থ আর অস্ত্র সংগ্রহের জন্য তখন ডাকাতির কথাই ভাবা হতো। বিপিনদা আমাদের দলে ডাকাতি করার বিরুদ্ধে মত দেন। কিন্তু আমাদের দলে একজন ছিল— নিতাই জানা। সে ছিলো ডাকাতির পক্ষে।

আমি এইরকম একটা ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। সেই ডাকাতিটি সফল হয়নি। এই ডাকাতির মামলাটি পরে ডাফ লেন ডাকাতির মামলা নামে পরিচিত হয়। এই ডাকাতির অ্যাকশনে আমার কাজ ছিলো অবসার্ভারের। পুলিশ জানতে পেরে যাওয়ায় এই ডাকাতিটি আর শেষ পর্যন্ত করা যায়নি। কিন্তু কেউ গ্রেপ্তারও হয়নি। নিতাই জানা বিপিনদাকে ডিফাই করে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। সেই নিতাই পরে খুব দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শেষ জীবনে সে শুধু পর পর বিয়ে করে যৌতুকের টাকায় জীবন কাটাত।

আমি ততদিনে পার্টির কাছে খুব দামি একজন কমরেড হয়ে উঠেছি। আমি বেশিদিন বেনারসে থাকিনি। পরে ঐ অঞ্চলের সঙ্গে আজমগড়, কানপুর ও মোগলসরাই অঞ্চলেও সংগঠন করেছি। বক্তৃতাও করেছি অনেক। ১৯৪৬ এর আগস্ট মাসে আমি এই অঞ্চলগুলি ছেড়ে যাই। উত্তরপ্রদেশের বেনারস-এর কমিউনিস্ট পার্টি-র জেলা কমিটির শাখায় যোগ দিই।

আমাদের মধ্যে তখনও কেউ কেউ পুরনো বিপ্লবী যুগের অনুশীলন বজায় রেখেছিলো। এক সময় আমরা পরস্পরকে বেত মেরে সহিষ্ণুতা পরখ করতাম। এই কাজগুলো এখন হাস্যকর বলে মনে হলেও কাজগুলো একেবারে ফেলে দেওয়ার বিষয় নয়। আমি বক্সিং-এ ভর্তি হয়েছিলাম কষ্ট সহ্য করা শেখার জন্য। বেতের দাগ পিঠে পড়েছে অনেকবার। বক্সিং চ্যাম্পিয়ানও একবার হয়েছিলাম হাওড়া জেলাতে। আমি লড়তাম লাইট-ওয়েট বিভাগে। সেখানে একবার একটা সাদা চামড়ার লোককে বেদম ঘুষি মেরে নক-আউট করে দিয়ে হিরো হয়ে যাই।

উত্তরপ্রদেশের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে যোগ দিই। এখানে বেনারস কটন মিল, মিউনিসিপ্যাল সুইপারদের ইউনিয়ন, জলকলের শ্রমিকদের নিয়ে ইউনিয়ন গড়ে তুলি। কমলাপতি ত্রিপাঠি ছিল উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসের নেতা। একবার মিউনিসিপ্যাল সুপারদের ধর্মঘট হয়েছে। ত্রিপাঠি এলাকার বাড়ির মেয়েদের নিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে আর আমরা সেই ঘটনার ছবি তুলছি। এরা সবাই ঝাঁটা নিয়ে আমাদের আক্রমণ করে। আমার মাথা বেঁচে গেলেও সারা দেহে বহু আঘাত লাগে। এমন আহত হয়েছিলাম যে পুরো তিনদিন খাটে শুয়ে কাটাতে হয়। আমাদের আর একজন কমরেড ঐ ঝাঁটার আঘাতে এমন আহত হন যে তাঁকে সাতদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়।

ঐ সময়ে উত্তরপ্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন জেড এ আহমেদ। উনি আলিগড় থেকে রাজ্য পার্টি চালাতেন। জেলার নেতা হিসেবে ছিলেন সুনীল সেনগুপ্ত। পরে এস পি ত্রিপাঠি আর রুস্তম সাটিন। ত্রিপাঠি উত্তরপ্রদেশের পিসি-র সদস্য ছিলেন। অন্য নেতারা জেলাস্তরের নেতা ছিলেন।

১৯৪৭ সালে বিটিআর ও যোশী লাইনের বিরোধ নিয়ে একটা দলিল আসে। কেরালার কোনো একজন কমরেড এই দলিলটা লিখেছিলেন। দলিলটির বিষয়ে একটা আলোচনার মাধ্যমে আমরা দলিলটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। অমূল্য সেন তখন অসুস্থ হয়ে আমাদের ওখানে কয়েকদিন ছিলেন। অমূল্য সেনও ঐ আলোচনায় ছিলেন। আমি তখন বিটিআর লাইনকে অন্ধের মতো মেনে নিই। এই মেনে নেওয়ার পেছনে একটা বড়ো কারণ ছিল যোশীর লাইনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা। ঐ দলিলটা অবশ্য সবাইকে দেওয়া হয়নি। আমিও দলিলটা হাতে পাইনি।

আমাদের পার্টিতে এত বোকা লোকেরা এসে জুটেছিলো যে পার্টি-র দলিলপত্র গুছিয়ে রাখার কোনো সংস্কৃতিই ছিলো না। যারা সিরিয়াসলি পার্টি করতে চাইতো তারা পার্টিতে হয়ে পড়েছিলো প্রান্তিক। আমি কমিউনিস্ট-সুলভ কাজ করাকেই সিরিয়াসলি কাজ করা বলছি। কাজের বদলে চলত অবান্তর ও অহেতুক দলাদলি।

আমি মোট তিনটি জায়গায় পার্টিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গ, বেনারস আর এলাহাবাদ-কানপুরে। সব কটা জায়গাতেই পার্টির নেতাদের মানসিকতায় রাজত্ব করেছে অসূয়া। বিলকুল বেওকুফ লোকজনই পৌঁছেছে নেতৃত্বে, অন্য কেউ সেখানে যাওয়ার সুযোগই পায়নি। মানুষের দুর্বলতা কাটানোর জন্য কোনো সচেতন প্রয়াস কখনও দেখিনি। যদি সক্রিয় আর বুদ্ধিমান কাউকে দেখলেই হিংসা হয় তাহলে কমিউনিস্ট সংস্কৃতি বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

হাওড়াতে পার্টি নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য সম্মেলন হবে। পার্টির সব কজন পুরনো নেতা সব দিক থেকে পুরোপুরি ব্যর্থ। কিন্তু তারা যাদেরকে মনোনয়ন দেবে তারাই আবার কমিটি সদস্য হবে। সংবিধানে এই কথা লেখা আছে, আবার নেইও। ব্যালট পেপারে প্রথমে বিদায়ী সদস্যরা নাম লিখবে, পরে থাকতে পারে অন্য নাম। ফলে যে সব কর্মী জনপ্রিয়, দক্ষ, কিন্তু বিদায়ী নেতাদের নেকনজরে নেই, তারা সর্বদাই আউট হয়ে যাবে।

একটা সম্মেলনের কথা বলি। লড়াইটা হচ্ছে মূলত আমার

সঙ্গে। সেই সভার সভাপতি প্রমোদ দাশগুপ্ত। যতগুলো নামের প্রস্তাব এসেছে তার সবগুলোই আমার নাম। সবাই হাততালি দিয়ে আমার নাম মেনে নিল। কিন্তু ভোটের সময় আমি হেরে গেলাম গোহারান। বেকুফ প্রতিনিধিরা ভাবছে আমায় ভোট দিচ্ছে, আসলে কিন্তু তারা ভোট দিচ্ছে অফিসিয়াল প্যানেলকে। অফিসিয়াল প্যানেল-এ নাম আছে ১ থেকে উনিশ, যেটা বিদায়ী সদস্যরা দিয়েছে। আর আমার নাম আছে ২০-তে। প্রতিনিধিদের ধারণা আমার নাম আছে ১-এ। এই রকম কৌশল আর দলাদলি ছিল মূল কাজ। অন্য কিছু করার দিকে নেতাদের মন ছিল না।

আমি যখন এই বিষয়টা নিয়ে প্রমোদবাবুকে চ্যালেঞ্জ করলাম, তখন প্রমোদবাবু গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কথা বলে বললেন যে উচ্চতর কমিটি বলেছে এই ভাবেই ভোট হবে। সময়টা ছিলো ১৯৫০-১৯৫৫, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি-র যুগ।

বেনারসের বেশিরভাগ কমরেডই বিটিআর লাইন মেনে নিলেন। আমি এবং একজন মহিলা কমরেড সবিতা মুখার্জী, বিটিআর লাইন মেনে নিলাম। কিন্তু রুস্তম মানেননি। সুশীল মেনেছিলেন।

এই লাইনের অনুশীলন হিসেবে ঠিক হলো যে জেলা কমিটি গঠিত হবে। আমি সেই কমিটির সদস্য হলাম।

এখন নতুন লাইনের অনুশীলন হিসেবে পার্টির কিছু কার্যক্রম নিতে হবে। বিটিআর-এর প্রস্তাবিত এক ধাক্কায় দুই বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য আমরা শ্রমিক অঞ্চল খুঁজতে লাগলাম। তখন বেনারস কটন মিলে লক-আউট চলছিল। বেনারস জেলা কমিটি বিটিআর লাইনের প্রভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে গেটের তালা ভেঙে শ্রমিকরা কারখানায় ঢুকবে এবং উৎপাদন চালু করবে। আমি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করি এবং 'সংশোধনবাদী' বলে গালাগাল খাই। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১০-১৫ দিন বাদে এই 'কারখানা দখল'-এর ঘটনা ঘটার কথা। এদিকে আমি ঐ অঞ্চলে সমীক্ষা করে জানতে পারলাম যে বেনারস কটন মিলের কোনো শ্রমিকই শ্রমিক মহল্লায় নেই। তারা মিলে লক আউট দেখে নিজ নিজ দেশের বাড়িতে খেতি করতে চলে গেছে। উড়িষ্যা থেকে আসা কিছু শ্রমিক বস্তিতে রয়ে গেছে। তারা বাইরের রাজ্য থেকে এসেছে বলে এতই ভীত যে তারা কোনো সক্রিয় কার্যক্রমে অংশ নেবে না। তারা কোনো অ্যাকশান-এ যেতে আদৌ উৎসুক নয়। মালিক যদি কোম্পানি খোলে তো তারা কাজে যাবে, নচেৎ তারা বসে থাকবে। আমি জেলা কমিটির কাছে বেনারস কটন মিলের এই অবস্থা এবং শ্রমিকদের মেজাজ-এর কথা রিপোর্ট করি। কমিটির প্রায় ৮-৯ জন সদস্য বললেন যে মানুষ এখন বিপ্লব করার জন্য উন্মুখ। শ্রমিকদের বর্তমান মেজাজের উল্লেখ করে আমি বলি যে কটন মিলের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে উৎপাদন করার কার্যক্রম একটি হঠকারি কাজে পরিণত হবে। এই কার্যক্রম হাতে নিলে সেই কাজে যোগ দিতে কেউই আসবে না। আমার ঘনিষ্ঠ মায়া ব্যানার্জী পর্যন্ত বললেন যে আমি ভুল করছি।

তো সেই তালা ভাঙার প্রোগ্রামের দিন দেখা গেলো কোনো শ্রমিকই আসেনি। কয়েকজন স্কুলের দিদিমণি তালা ভাঙতে গিয়ে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। ঠিক ঐ সময়েই সারা ভারত রেল ধর্মঘটেরও ডাক ছিলো। মোগলসরাই-এ রেল শ্রমিকদের আমি ছিলাম সংগঠক।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সংশোধনবাদ দিয়ে শুরু না করে উপায় নেই। আর সংশোধনবাদ নিয়ে বলতে গেলে ক্রুশ্চভ-এর কথা দিয়ে শুরু না করেও উপায় নেই।

ক্রুশ্চভ কী ভাবে সংশোধনবাদ আনল? প্রথমে তাত্ত্বিকভাবে সংশোধনবাদ-এর বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করে, তারপর সেই তত্ত্বের অনুশীলনের কথা বলতে শুরু করে। তার বক্তব্য সংক্ষেপে খানিকটা এই রকম। নির্বাচনের মাধ্যমে, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে, সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব। সেটা করতে হলে কমিউনিস্ট পার্টি-র চরিত্র পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই কাজ করতে হলে পার্টি-কে 'জনগণের পার্টি' বা 'মাস পার্টি'-তে পরিণত করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টি-কে শ্রেণীভিত্তিক পার্টি থেকে সমাজের সকল শ্রেণীর পার্টিতে পরিণত করতে হলে পার্টি সদস্য করার নিয়ম-শৃঙ্খলা অনেক শিথিল করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই বিষয়টি মনে-প্রাণে গ্রহণ করে।

আগে সিপিআই বা সিপিএম পার্টি-তে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে পার্টি সদস্য করার সংস্কৃতি ছিলো, তা ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। যে বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি সমঝোতা করা হয় তা হলো পার্টি সদস্য করার সময় ব্যক্তির চরিত্র বিষয়টিকে অবহেলা করা।

জি এন সাইবাবার মুক্তি চাই!

গত ৯ মে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যপক জি এন সাইবাবা-কে 'মাওবাদী যোগসাজস'-এর সন্দেহে নয়াদিল্লি থেকে গ্রেপ্তার করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। উল্লেখ্য, দৈহিক ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবসময় মেহনতি মানুষের লড়াইয়ের পাশে সামিল হতেন। সামিল হতেন মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে।

ইতিমধ্যে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে যে লক-আপে তাঁকে চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়েছে। মনে রাখতে হবে অন্যের সহায়তা ছাড়া তিনি চলাফেরা করতে অক্ষম। তাঁকে দেওয়া হচ্ছে না প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও।

এই অন্যায় গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে 'অনীক' এবং অবিলম্বে তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছে।

আগে কোনো ব্যক্তিকে পার্টি সদস্য করার আগে ৬ মাস থেকে ১ বছর ক্যান্ডিডেট সদস্য হিসেবে রাখা হতো। সেই এক বছর সেই মানুষটি কী করতেন? তাঁরা পার্টির বুনিয়াদি সাহিত্য পড়া, পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া ইত্যাদি করার কথা পার্টি সংবিধানে বলা ছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হতো না, কেউ এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সিরিয়াস ছিল না।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। তখন সিপিআই-এর যুগ। একটা সময় ঠিক হলো যে একটি পার্টি বিদ্যালয় চালানো হবে। পার্টির নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে শিক্ষামূলক কাজ করার জন্য একটি শিক্ষা সমিতি তৈরি করে সেই সমিতির মাধ্যমে কাজ করা হবে। এই সমিতি বা কমিটিতে হাওড়া থেকে আমি আর অজয় দাশগুপ্ত, প্রমোদ দাশগুপ্ত বা পিডিজি, জ্যোতি বসু বা জেবি ছিলাম। নেতাদের ভেতর একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাই অন্য জেলার।

এই কমিটির বৈঠক মাত্র একবারই হয়। ১৯৬০ সালের আশপাশে একবার 'স্বাধীনতা' দপ্তরে হয়। বৈঠকের স্থান ঠিক করে দেন স্নেহাংশু আচার্য। এই ঘটনার কিছুদিন পর এই স্বাধীনতা পত্রিকা উঠে যায়। বৈঠক শুরু হতে অনেক দেরি হয়, কেননা জেবি আসতে অনেক দেরি করেন। তিনি এসেই বললেন যে এই কমিটিতে আমাকে কেন রেখেছ তা বুঝলাম না। আমি ইংল্যান্ডে থাকার সময় যতটা মার্কসবাদ শিখেছিলাম, এতদিন সংসদ করতে করতে তার প্রায় সবটাই ভুলে গেছি।

এই বৈঠক থেকেই সিপিআই ও ভবিষ্যতের সিপিএম-এর বিরোধ-বিভেদ সামনে আসে। পরে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা উঠে যাওয়ার পর এই কমিটির বৈঠক আর বসেনি।

এই কমিটি ছোটো ছোটো বেশ কয়েকটি পুস্তক পার্টি-র শিক্ষা সিরিজ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরাও 'স্বাধীনতা' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত রাজনৈতিক বিষয়েও প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কমিউনিস্টদের অনেক বিষয় মানুষের হয়ত অপছন্দের ছিল। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কমিউনিস্ট-দের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণ মানুষ কমিউনিস্টদের জানতো জ্ঞানী, সৎ হিসেবে। তারা ভাবত কমিউনিস্টরা প্রচুর পড়াশুনো করে। কমিউনিস্ট-দের মনেও তখন অদ্ভুত ধারণা ছিল। যেমন কমিউনিস্টদের মধ্যে অনেকেই ভাবতেন যে স্নান না করা, নখ না কাটা, এ সমস্ত মহাবিপ্লবী কাজ। ফলে অনেক কমরেডই মনে করতেন যে এই সব 'মহা-বিপ্লবী' কাজ না করলে সে বিপ্লবী হয়ে উঠতে পারবে না। বিপ্লবী হওয়ার জন্য যে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিলো, পার্টি কোনওদিনই কমরেডদের মধ্যে এই সব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতন করেনি।

অনুলিখন - শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

মার্কেজ-এর রাজনীতি বিষয়ক একটি দুটি কথা

১১ পৃষ্ঠার পর

এভাবে দেখলে তাঁর অনেক আপাত বিরোধকে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। আমরা বুঝতে পারি কেমন করে একজন লেখক তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ না করেও আগাপাশতলা রাজনৈতিক থেকে যেতে পারেন এবং গভীর বিশ্বাস থেকে বলতে পারেন:

> "আমরা, যাদের কোনো কিছু বিশ্বাস করার অধিকার নেই, সেই গল্পকাহিনীর উদ্ভাবকেরা, মনে করি এ কথা বিশ্বাস করার অধিকার আমাদের আছে যে এক নতুন ধরনের কল্পরাষ্ট্র গঠনের কাজে লেগে পড়া যায়, এখনও খুব দেরি হয়ে যায়নি। গড়ে উঠবে জীবনের এক চূড়ান্ত ও নূতন কল্পরাষ্ট্র যেখানে কে কীভাবে মারা যাবে, তা অন্যেরা ঠিক করে দেবেনা। যেখানে শ্রম সত্য হবে, সম্ভব হবে সুখী হওয়া, আর যেখানে যেসব জাতিরা দণ্ডিত হয়েছিল একশো বছরের নিঃসঙ্গতায়, তারা অবশেষে ও চিরকালের মতো দ্বিতীয় সুযোগ পাবে পৃথিবীতে।[৮]

তথ্য ও উদ্ধৃতিসূত্র

১। *লিভিং টু টেল দ্য টেইল:* গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, প্রথম ভিন্টেজ আন্তর্জাতিক সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ৩১১
২। *ঐ*, পৃ. ২১২
৩। *বিজ্ঞাপন পর্ব*, চতুর্বিংশতি সংখ্যা, ১-৪, ক্রোড়পত্র, পৃ. ৫৩
৪। *লিভিং টু টেল দ্য টেইল*, পৃ. ৩১৯
৫। *বিজ্ঞাপন পর্ব*, চতুর্বিংশতি সংখ্যা, ১-৪, ক্রোড়পত্র, পৃ. ৩৯
৬। *ঐ*, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর নোবেল বক্তৃতা, অনুবাদ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৭-৯৮
৭। *ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিচ্যুড*, পেঙ্গুইন বুকস ইন্ডিয়া (প্রা) লিঃ, ১৯৯৬, পৃ. ১০৪-১০৫
৮। *বিজ্ঞাপন পর্ব*, চতুর্বিংশতি সংখ্যা, ১-৪, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-এর নোবেল বক্তৃতা, অনুবাদ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯৯

স্মরণ

প্রয়াত সুনীতি কুমার ঘোষ

নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা ও তাত্ত্বিক সুনীতি কুমার ঘোষ প্রয়াত হলেন গত ১১ মে, ২০১৪। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলে ৯৬ বৎসর। ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলন থেকে শুরু হয় তাঁর কমিউনিস্ট বিপ্লবী জীবন। তিনি এআইসিসিসিআর-র সদস্য ছিলেন এবং সিপিআই(এমএল) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসাবে 'লিবারেশন'-এর দায়িত্বে ছিলেন ১৯৭২ সালে পর্যন্ত। বহু তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের তার অবদান রেখেছেন মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্ত।

অনীক এই প্রয়াত বিপ্লবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

প্রবন্ধ

হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহ ও মুর্শিদাবাদ

অরূপ চন্দ্র

প্রাচীন বেদে বলা হচ্ছে— শিকার ও পাশা খেলা ছেড়ে কৃষিকাজে মন দিলে গরু ও স্ত্রী মিলবে। স্ত্রী, গরু ও জমির থেকে বড় সম্পদ আর কিছু নেই (স্ত্রী-কে প্রাচীন কাল থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হত)। আর স্ত্রী, গরু ও ভূমি কোথা থেকে পাবে? অন্য গোষ্ঠী আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলে তাদের বধূ, কন্যা, গৃহপালিত পশু ও জমি সবই পাবে। জমি কার? ...প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র বলছে, যে শিকারি প্রথম তীর মেরে পশুকে নিহত করে সেই পশু যেমন তারই প্রাপ্য, তেমন যে মানুষ একখণ্ড জমি চযে বা নিষ্কর জমিকে চাষযোগ্য করে তোলে সেই ঐ জমির মালিক। অর্থাৎ 'লাঙল যার জমি তার', 'জাল যার জলা তার', এসবই তাহলে শাস্ত্রের বচন। মুসলমান শাস্ত্রেও পাওয়া যায়, এ পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্, তিনিই এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কোন বিশেষ মানুষ কোন বিশেষ জমির মালিক নন।

ভারতে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক যুগেও জমির প্রকৃত মালিকানা কোন সামন্ত নরপতি বা ব্যক্তিবিশেষের ছিল না। শক্তিশালী সামন্ত নরপতি এক একটি গ্রামভিত্তিক কৃষিজমির উপর গ্রামসমাজের প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন আবার রাজার কাছে তার অংশও দিয়ে আসতেন। সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের বড় কারণ ছিল বন্যা খরা ইত্যাদি ছাড়াও নগরের শাসকদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ব্যাপক বিদ্রোহ।

বৈদিক যুগে কৃষকদের ততটুকু জমিই থাকত যা তারা সপরিবারে চাষ করতে পারত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হস্তশিল্পে লোহার ব্যবহারে সমতাবাদী বৈদিক সমাজ ভেঙে গেল। কৃষিভিত্তিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ধীরে ধীরে গড়ে উঠল।

আবার মৌর্য যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০) দেখা যায়, সমস্ত অর্থনৈতিক কাজকর্মে রাজার সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ। গড়ে উঠল রাষ্ট্রীয় খামার— সেখানে ভাড়াটে মজুর হিসেবে নিয়োজিত হলো শূদ্র সমাজ আর তাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করত বৈশ্যরা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায়— মৌর্য যুগে ভাগচাষ প্রথারও প্রচলন হয়েছিল। রাষ্ট্র বীজ বলদ সহ কৃষি উপকরণ যোগান দিত।

ঐতিহাসিক কোশাম্বি ও রামশরণ শর্মা জানাচ্ছেন, গুপ্তযুগে ভারতীয় গ্রাম সমাজ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশাল খামারের পরিবর্তে ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার দ্বারা উৎপাদন, তেজারতি কারবারের সূচনা, মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন এই যুগের বৈশিষ্ট্য।

তুর্ক-আফগান বা সুলতানি যুগে (১২০৬-১৫২৬) পদস্থ রাজকর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গির দানের প্রথা চালু হয়, কিন্তু তা বংশানুক্রমিক ছিল না।

মোগল যুগে বাদশার আয়ের প্রধান উৎস ছিল জায়গির থেকে সংগৃহীত রাজস্ব। গ্রামসমাজের ওপর আরোপিত ছিল রাষ্ট্রীয় সামন্ততন্ত্র আর দুইয়ের মাঝে ছিল রাজস্ব আদায়কারী জায়গিরদার বা মনসবদার। ভারতে মুসলমান শাসনের যুগেও জমির মালিকানাস্বত্ব ছিল পুরোপুরি রাষ্ট্রের। জমিদাররা ছিল আইনত খাজনা আদায়কারী মাত্র। তবু মোগল আমলের মনসবদার ও ইজারা নীতি নতুন মালিক শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল অনেক ক্ষেত্রেই।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তীব্র শোষণ ও অত্যাচারের ফলে বঙ্গদেশে ১৭৬০ সাল থেকে শুরু হয় সংগঠিত কৃষকবিদ্রোহ— সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, যা ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেয়, তাদের শঙ্কিত করে তোলে। ইংরেজ শাসনের অস্তিত্ব রক্ষা করতে তারা উপায় খুঁজতে শুরু করে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধ খাতে যে ব্যয় হত তার কানাকড়িও ব্রিটেন থেকে আসত না। সুতরাং বিরাট সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার, সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ব্যবসার পুঁজি, সীমানা রক্ষা, উপনিবেশের দখল ও বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় অর্থ তার কৃষকশ্রেণীর ওপর অস্বাভাবিক খাজনা তীব্র নিপীড়নের মাধ্যমে আদায় করত, আর এই কাজে তাদের সহযোগিতা করত দেশীয় সামন্তশ্রেণী, যাদের নির্দিষ্ট এলাকা থাকলেও কাগজে কলমে জমির মালিকানা ছিল না। দেশীয় এই জমিদার মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষি উৎপাদকদের কাছ থেকে অস্বাভাবিক বর্ধিত রাজস্ব আদায় করাই ছিল বিদেশি বণিকদের কাজ। তাই অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, রেশম চাষিদের বিদ্রোহ, চোয়াড় বিদ্রোহ, দিনাজপুর-রংপুরের তীব্র কৃষক বিদ্রোহ প্রভৃতি পরপর কৃষক বিদ্রোহ থেকে রক্ষা পেতে ব্রিটিশ বণিকরা উপায় খুঁজতে লাগল। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করে নতুন জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি করলেন। তারা হলো কাগজে কলমে জমির মালিক এবং ব্রিটিশের এই বদান্যতায় নতুন এই শ্রেণীটি পুরোপুরি ব্রিটিশ তাঁবেদারে পরিণত হলো। এবং অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হলো। তারা বংশানুক্রমে জমির দখলি স্বত্ব পেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক বর্গাদার ও দিনমজুরে পরিণত হলো।

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় সুধী প্রধানের 'তেভাগা আন্দোলনের পৃষ্ঠপট' প্রবন্ধ থেকে আরও জানা যায়, ভারতে বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা বাদশাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রকেই জমির মালিক বলে বর্ণনা করেছেন একবাক্যে। আবুল ফজল বাদশার কর চাপানোর অধিকারকে 'সার্বভৌমতা'র দাবি বলে পরিচয় দিয়েছেন, কারণ শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব তাঁর। কোথাও রাজার সম্পদ

বৃদ্ধির জন্য খাজনা হিসেবে রাজস্বকে বর্ণনা করা হয়নি। আইন-ই-আকবরিতে জমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকৃত আছে।

ইংরেজ প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থা আসলে কৃষকের স্বত্ব হারানোর ব্যবস্থা। এর ফলে ভারতের প্রাচীন গ্রামসমাজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। কৃষকসমাজ নানাভাবে নিঃস্ব দুর্বল ও বিভক্ত হয়ে যায়। অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, যারা ছলে বলে কৌশলে কৃষকদের ছিবড়ে করে দেয়। এর ফলে শুরু হলো অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ। কৃষকদের চাষের অধিকারের স্বত্ব বিলোপ এবং সমস্ত জমির একমাত্র মালিকানা স্বত্ব বংশপরম্পরায় জমিদারদের দেওয়া হলো। এই ভয়ংকর ব্যবস্থা পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটেনি।

'ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল
ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
...শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে, ওরা কাজ করে।'

প্রচলিত ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ''ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি-পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয়, ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদিবা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে— পাঠান, মোগল, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ... ভারতবাসী কোথায়, এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না।...''

ভারতীয় জনগণের আশি শতাংশের অধিক কৃষক-শ্রমিক জনসাধারণ। সুতরাং তাঁদের জীবনযাপন ও সংগ্রামই হচ্ছে ভারতীয় ইতিহাসের চালিকাশক্তি।

মার্কস যেমন বলেছেন— ''মানব জাতির ইতিহাস কেবল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোষিত শ্রেণীসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ইতিহাস। এই শ্রেণী সংগ্রামই চালকশক্তি রূপে মানবজাতিকে প্রকৃত ইতিহাসের আরম্ভের দিকে নিয়ে যায়।''

ড. শক্তিনাথ ঝা তাঁর 'দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে অনন্ত ভট্টাচার্য' নিবন্ধে লিখেছেন, ''...তথাকথিত অ্যাকাডেমিক গবেষকগণ ও গবেষণাগুলি প্রচলিত তত্ত্ব প্রচার করেছে যে মুর্শিদাবাদের মাটি প্রতিবাদ বা সংগ্রামের উপযুক্ত নয়; এখানে বিপ্লবী আন্দোলন হয়নি; হয়নি কোন গণসংগ্রাম— এ মাটির ঐতিহ্যে আছে মীরজাফরী বিশ্বাসঘাতকতা।... আর এই বমন করা তথ্যাদি 'সত্য' হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছি।'' ড. ঝা-এর সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। মুর্শিদাবাদের মাটি অসংখ্য সফল কৃষক বিদ্রোহের মাটি।

গত এক হাজার বছরে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বড় বড় বারোটি সফল কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। এই কৃষক বিদ্রোহগুলিকে সফল বলছি এই কারণে যে এইসব বিদ্রোহের ফলে ঘটে গেছে প্রভূত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। তাই এগুলি ইতিহাসের চালিকাশক্তি। এই বিদ্রোহগুলি শাসকশ্রেণীকে বাধ্য করেছে আইন ও নিয়ম পরিবর্তনে এবং জনগণের প্রতি সহনশীল হতে, রাজধর্ম রাজচরিত্র সংশোধনে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে। সমাজনেতাদের সতর্ক করেছে।

মুর্শিদাবাদের মাটি বিশ্বাসঘাতকদের মাটি নয়। এ মাটি স্বাধীনচেতাদের মাটি। এ মাটি স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী বিদ্রোহীদের মহান জন্মদাতা। এখানেই এক সময় আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার আগে গড়ে ওঠে বাংলার প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম গৌড়রাজ্য যার রাজধানী ছিল বহরমপুরের মাত্র আট কিলোমিটার দক্ষিণে কর্ণসুবর্ণ নগরী। এখানেই বাংলা তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতার আলোকবর্তিকা নির্বাপিত হওয়ার সূচনা হয় ১৭৫৭ সালে। আবার এখানেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৫৭ সালে। মহান বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য সেনের ছাত্রজীবন কেটেছে এখানেই। এখানেই তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি। ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের কথায়— ''বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের জনৈক অধ্যাপকের কাছেই দেশের জন্য আত্মত্যাগের দীক্ষায় প্রথম পাঠ নেন তিনি।'' মুর্শিদাবাদের মাটি কৈবর্ত, সন্ন্যাসী, ফকির, ফরাজী, ওয়াহাবী, নীল, সাঁওতাল, তেভাগা প্রভৃতি কৃষক আন্দোলনের পতাকা তুলে ধরার মাটি। স্বাধীনতা আন্দোলনে অসহযোগ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন সহ সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন পদ-চারণায় উজ্জ্বল মাটি। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বার্থে এখানে ছুটে এসেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষ বোস, মহাত্মা গান্ধি, কাজী নজরুল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন বিহারী পাল প্রমুখ। এই সমস্ত আন্দোলনের উত্তরাধিকার বহন করেছে বিগত নকশালপন্থী কৃষক আন্দোলনের বিস্তৃতি। নবাবী আমল ও ব্রিটিশ আমলে মুর্শিদাবাদে কৃষক ও তাঁতিদের ওপর তীব্র শোষণে পীড়নে বারবার ঘটেছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ১১৭৬ (ইংরাজী ১৭৭০-৭১)-এর মন্বন্তর ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২-১৯৪৩ সালে তীব্র দুর্ভিক্ষ। ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের সময় ১৮১২-১৩ সালের মহামারীতে লাখে লাখে মানুষ মারা যায় মুর্শিদাবাদে। ১৮৯৭ সালের বিরাট ভূমিকম্পের পর মহামারীতে মারা যায় কয়েক লক্ষ মানুষ। আর হাজার হাজার তাঁতিদের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়ে মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পকে ধ্বংস করে বিলেতী কাপড় চালানোর ব্রিটিশ চক্রান্তের কথা কে না জানে। এর বিরুদ্ধে কৃষক অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে বারবার। এখানে সেইসব কৃষক বিদ্রোহগুলিই আলোচিত হল যেগুলি মুর্শিদাবাদের মাটিতেও হয়েছে। কিন্তু এছাড়াও বঙ্গদেশে অনেক কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে— যেমন মুন্ডা বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ, দিনাজপুর-রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, সন্দীপের কৃষক বিদ্রোহ, বগুড়ার বিদ্রোহ, পাগলপন্থী বিদ্রোহ প্রভৃতি।

কৈবর্ত বিদ্রোহ (আনু: ১০৭০-৭১)

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে পাল রাজত্ব ও তৎকালীন সামন্তরাজাদের বিরুদ্ধে কৈবর্ত প্রজাদের কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। সম্ভবত এটিই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে প্রথম সফল সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহ। যদিও এই কৃষক বিদ্রোহের ভরকেন্দ্রটি ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর। কৈবর্ত কৃষক প্রজারা পাল সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ দখল করে নেয়—মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি অঞ্চল, মালদহ, রাজশাহী হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর পর্যন্ত। ঐ বিশাল অঞ্চলের প্রায় সমস্ত সামন্তরাজাই পালিয়ে যায়, কেউ কেউ কৃষক নেতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। পাল রাজাদের এবং তাদের অধীনস্ত সামন্তদের তীব্র শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধেই এই কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। তাঁরা তাদের রাজধানী স্থাপন করেন দক্ষিণ দিনাজপুরের 'ডমরপুরে'। কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা দিব্যক রাজা হন। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রাজধানী মহীপাল নগরে বিদ্রোহী কৃষকদের হাতে নিহত হন। কৈবর্ত বিদ্রোহ ১০৭০-৭১ সালে শুরু হলেও সম্ভবত কৈবর্তরা পাল রাজধানী মহীপাল আক্রমণ করেন ১০৭৫ সালে। কারণ দ্বিতীয় মহীপাল রাজা ছিলেন ১০৭২ থেকে ১০৭৫ পর্যন্ত (আনুমানিক)। অন্য মতে রাজধানী মহীপালে দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হননি, তাঁর রাজ্যমধ্যে কৈবর্ত কৃষকগণ বিদ্রোহ করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংবাদে তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে ডমরপুর আক্রমণ করেন এবং সেখানেই তিনি পরাজিত ও নিহত হন ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে। এবং তারপর রাজা হন দ্বিতীয় মহীপালের ভাই শূরপাল (১০৭৫-১০৭৭)। কৈবর্তরাজ সাগরদিঘিতে কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রতীক একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন বলে মনে করেন অনেকে। একইভাবে আরেকটি বিজয়স্তম্ভ নির্মিত হয় কৈবর্তরাজের রাজধানী সংলগ্ন ডমরপুরের নিকটে কৈবর্তদিঘিতে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সাগরদীঘির বিজয়স্তম্ভটি কৈবর্ত বিদ্রোহের বিজয়স্তম্ভ নয় সম্ভবত! এটি রাজা দেবপালের সারা ভারত বিজয়ের বিজয়স্তম্ভ এবং নবম শতাব্দীতে তৈরি। এই স্তম্ভটি বারোকোণা। এই বারোটি কোণ বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রতীক। পাল রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। ডমরপুরের স্তম্ভটি অষ্টকোণা। দক্ষিণ দিনাজপুরের ডমরপুর বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত একটি গ্রাম। কৈবর্তরা প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন এবং অনেকে প্রজাহিতৈষী কাজকর্মের নজির রাখেন। তবে কারো কারোর মতে, তাঁদের রাজত্ব এতটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবু দোর্দণ্ডপ্রতাপ পালরাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠা এবং তা বেশ কিছু বছর টিকিয়ে রাখা ইতিহাসের বিরল ঘটনা।

কৈবর্তরাজ দিব্যকের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদক রাজা হন। এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহাপরাক্রমশালী ভীম রাজা হন।

রাজা দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই শূরপাল এবং তারপর অপরভাই রামপাল সিংহাসনে বসেন এবং কৈবর্ত কৃষকরাজ উচ্ছেদে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি বহু সামন্তরাজাকে একত্রিত করেন মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি অঞ্চলে। জানা যায় রামপালের এই অভিযানে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যোগ দেয় নদিয়া, হুগলি, বীরভূম, বর্ধমান, উড়িষ্যা ও উত্তর বিহারের অনেক সামন্ত রাজারা। সাগরদিঘি ছিল সেই সময় পালরাজাদের সেনানিবাস। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৈবর্তরাজ উচ্ছেদে অগ্রসর হওয়ার আগে সাগরদিঘির কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রতীক বিজস্তম্ভটি ভেঙে দেন। পরে অবশ্য ভগ্নাংশটি উদ্ধার হয়েছে সাগরদিঘির জল থেকে। এটি কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রতীক বলে রাজা রামপাল ভেঙে দিয়েছিলেন, না কৈবর্তরাজ দিব্যক মহীপাল নগর আক্রমণ করে পাল রাজাদের ভারত বিজয়ের প্রতীককে ভেঙে দিয়েছিলেন— দ্বিতীয়টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ ডমরপুরে তৈরি কৈবর্ত বিদ্রোহের বিজয় স্তম্ভের সঙ্গে সাগরদিঘির বিজয়স্তম্ভের স্থাপত্যের অনেক অমিল।

এরপরে ডমরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রামপাল সাগরদিঘি থেকে। সম্ভবত লালগোলার নিকটবর্তী পদ্মার ওপরে পরপর নৌকো লাগিয়ে সেতু তৈরি করে ওপারে গিয়ে অতর্কিতে ডমরপুর আক্রমণ করেন। তুমুল যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীম মরণপণ লড়ায়ে পরাজিত ও নিহত হন। কৈবর্ত কৃষক সৈন্যরা নগ্ন হয়ে মোষের পিঠে চড়ে তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই করতো।

রাজা রামপাল তখন গৌরের নিকটবর্তী রামাবতী নগরে পাল রাজত্বের রাজধানী স্থাপন করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতমানস'-এ এসব ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। রামাবতী নগরের বর্ণনাও পাওয়া যায়। তবে রামাবতীর প্রকৃত অবস্থান জানা যায়না। রামপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন এবং পুরোনো পাল রাজত্বের বেশ কিছুটা পুনরুদ্ধার করেন। ১০৭৭ থেকে ১১৩০ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তবে কেউ কেউ মনে করেন বা বিকৃত ব্যাখ্যা করেন যে এটি হিন্দু নিম্ন শ্রেণীর ওপর বৌদ্ধরাজাদের অত্যাচারের ফলশ্রুতি—একটি ধর্ম-যুদ্ধ, যার ফলে কৈবর্ত মাহিষ্য কৃষকরা বৌদ্ধ রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। নানা বিশ্লেষণে পাওয়া যায় এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে একথা ঠিক নিম্ন শ্রেণীর প্রজাদের এই সাহস ও আস্ফালনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রামপাল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বহু সামন্ত ও জমিদারগণকে একত্রিত করতে পেরেছিল এবং কৈবর্ত সৈন্যবাহিনী ও রাজা ভীমের পরিবারবর্গকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল যা শ্রেণীঘৃণা ছাড়া আর কি!

কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের শুরু বলে ধরা হয়। চর্যাপদের কবিদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবর্ণের এবং তারা কৈবর্ত বিদ্রোহ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। চর্যাপদ সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম লুইপাদ ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। এবং তিলপাদ সহ অনেক পদকর্তাই ছিলেন কৈবর্ত।

বিদ্রোহের পক্ষে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে তাদের পদগুলি গড়ে উঠতে থাকে। আর উচ্চবর্ণের সংস্কৃতভাষার পাশাপাশি মাগধি প্রাকৃত হয়ে বাংলাভাষার লিখিতরূপ গড়ে ওঠে। যে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লব সাহিত্য সংস্কৃতিকে আলোড়িত করে। চালনা করে নতুন পথে, উন্নত স্তরে নিজেদের অবস্থান পৌঁছে দিতে।

মোগল শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ

আকবরের ধর্মসংস্কারের বিরুদ্ধে তথা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে যে কৃষক বিদ্রোহ হয় মুর্শিদাবাদ ছিল তার কেন্দ্র।

সমগ্র মোগল আমলেই কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা ভারতীয় কৃষককুলকে ছিবড়ে করে দিয়েছিল। দেশজয় ও যুদ্ধজয়ের জন্য এবং সম্রাট, আমীর, ওমরাহ ও অভিজাত জায়গিরদার ও তালুকাদারদের অপরিমিত বিলাসব্যসনের জন্য কৃষকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কর চাপানো হত। খাজনা আদায় না হলেই অমানবিক বর্বর নিপীড়ন চলতো চাষিদের ওপর। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মোগল যুগেই তাই কৃষক ও জমিদারদের বিদ্রোহ সমগ্র ভারত জুড়েই দেখা যায়। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর মন্তব্য করেছিলেন, ''বহু অঞ্চলে কাঁটাঝোপের দুর্ভেদ্য আশ্রয়ের ওপর নির্ভর করে কৃষকরা বিদ্রোহ করতো এবং খাজনা প্রদানে অস্বীকার করতো।''

খাজনা প্রদানে অসমর্থ হয়ে কৃষকরা চাষ বন্ধ করে দিত। এর ফলে বহু জমি অনাবাদি পড়ে থাকতো, জঙ্গলে পরিণত হত। তারা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত শাসনকর্তাদের অত্যাচারে। অনেক সময়েই তারা স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি বিক্রি করে দিত। এর ফলে একদিকে নতুন করে দাসশ্রেণীর উদ্ভব এবং অভিজাতদের অসংখ্য রক্ষিতা এবং বাদশাদের হারেম পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিলাসব্যসন, জাঁকজমক আর রক্ষিতা, নর্তকী, ক্রীতদাসে বেষ্টিত হয়ে থাকতো মোগল বাদশারা, উচ্চ প্রশাসনিক রাজ কর্মচারীরা এবং অন্যান্য অভিজাতরা। অনেক কৃষকই দস্যু এবং ডাকাতে পরিণত হয়েছিল, অনেকেই আবার জমিদারদের আশ্রয় চাইত এবং জমিদারদের লেঠেলে পরিণত হত। কেউ কেউ মারাঠা বাহিনীতে যোগ দেয়। আর জমিদাররাও এই নিপীড়িত কৃষকদের কাজে লাগিয়ে শক্তিশালী হয়ে একদিকে চাষিদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে খাজনা আদায় করত অন্যদিকে অনেকেই মোগল শাসনকর্তাদের কর দিতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ সংগঠিত করত।

আকবরের আমল থেকেই কৃষকদের ওপর করের বোঝা সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। জায়গিরদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। তারা নির্মমভাবে কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করে মনসবদারদের প্রদান করত, এইভাবে সামরিক বাহিনীর ভরণপোষণ চলত। এইভাবেই মোগল শাসকশ্রেণী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয়ের লুটের মাল এবং চাষিদের ছিবড়ে করে দিয়ে বিশাল সম্পদ গড়ে তুলেছিল। পর্যটক বার্নিয়ে চাষিদের ওপর জায়গিরদারদের অত্যাচারের এক ভয়াবহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।।

মোগল আমলের ইজারা-নীতির ফলে ইজারাদারদের লক্ষ্যই ছিল কৃষকদের কাছ থেকে নিষ্ঠুরভাবে কর আদায়। ইজারা নীতির ফলেই জোতদার-তালুকদার এক নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হল।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মোগল যুগেই কৃষক ও জমিদারদের বিদ্রোহ শুরু হয়। ইরফান হাবিবের লেখায় পাওয়া যায়, ''কৃষকদের দুটি পথ ছিল— হয় অনাহার বা দাসত্ব, নয় সশস্ত্র প্রতিরোধ''। এই সময়ে পাঞ্জাবে সৎনামী, জাঠ ও শিখ কৃষক বিদ্রোহ হয়।

আকবরের আমলে ও জমিদারদের বড় সশস্ত্র বিদ্রোহের সংখ্যা ছিল ২৯টি। ১৫৬২ ও ১৫৭৭-এ আগ্রার কৃষকরা বিদ্রোহ করে। জাহাঙ্গীরের আমলেও আগ্রা ও থাট্টায় এক প্রবল কৃষক বিদ্রোহ হয়। কুচবিহার ও আসাম সীমান্তেও প্রবল কৃষক বিদ্রোহ হয়।

আকবরের ধর্ম সংস্কারের বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে ১৫৮০ সালের কৃষক বিদ্রোহ এবং ঔরঙ্গজেবের আমলে প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের মূলে ছিল এই প্রবল অর্থনৈতিক শোষণ ও কৃষকদের ওপর অত্যাচার। তাই প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন এক সম্মিলিত যুগ্ম বিদ্রোহের রূপ পায়। ঔরঙ্গজেবের আমলে ১৬৬৫ সালের মাতিয়া কৃষক বিদ্রোহ এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য।

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)

ইংরেজদের বর্বর শাসন শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ ঘটেছিল মুর্শিদাবাদের মাটিতে। মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম শহরে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য পীর ফকিরদের সমাধি মাদারী ফকিরের থান এবং ফকির বিদ্রোহের মহানায়ক মজনু শাহের দত্তক পুত্র চেরাগ আলী শাহের বহরমপুর শহরের গোরাবাজার নিমতলায় অবস্থিত সমাধিটিও এর সাক্ষী বহন করছে।

অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত তার *চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত* বইতে বলেছেন— ''অষ্টাদশ শতকের শেষ চল্লিশ বছর ধরে (১৭৬০-১৮০০) সন্ন্যাসী ফকিরদের ধর্মীয় সামাজিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে অত্যাচারিত কৃষক ও তাঁতিদের যে ঐক্যবদ্ধ অথচ বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার, জমিদার ও কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে চলেছিল; তাতে মুর্শিদাবাদের কৃষক ও তাঁতিরাও পশ্চাৎপদ থাকেনি।''

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ যা আসলে কৃষক বিদ্রোহ— বলা যায় ইংরেজ শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ভরকেন্দ্রটি ছিল উত্তরবঙ্গ। এই সময়কালেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদার মুর্শিদাবাদের দেবী সিংহের বর্বর অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করে দিনাজপুর ও রংপুরের কৃষকরা। রংপুর-দিনাজপুরের প্রজা বিদ্রোহও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের অংশ হয়ে যায় ১৭৮৩ সালে। অন্যদিকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ত্রিশ লক্ষের বেশি কৃষকের

মৃত্যু হয় বাংলায়। বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল জমিদার, সামন্তরাজা, ইংরেজ কুঠি প্রভৃতির ওপর আক্রমণ। সমগ্র বাংলা ও বিহারে এবং আসামেও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। মূল নেতৃত্বে ছিলেন মজনু শাহ। এছাড়াও মুশা শাহ, চেরাগ আলী, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী প্রভৃতিরা উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র তীরে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক মজনু শাহের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের লড়াই হয়। সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহীরা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে পূর্ববঙ্গ থেকে রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর হয়ে নেপাল সীমান্তবর্তী তরাই এলাকা পর্যন্ত সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মজনুর আড়াই হাজার বিদ্রোহী সেনার সঙ্গে বগুড়াতে বিরাট ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধে মজনু পরাজিত হয়। এবং বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। এটা ১৭৭১ সালের ঘটনা। ১৭৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর দেড় হাজার সন্ন্যাসী ইংরেজ সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি লড়াই করেন এবং এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন টমাস নিহত হয়। ১৭৭৩ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী সাতহাজার পদাতিক ও পাঁচশো অশ্বারোহী সন্ন্যাসী ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই গ্রামে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এখানে ইংরেজ সেনাপতি এডওয়ার্ডস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৭৮৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর বগুড়া জেলার কলেশ্বরে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে মজনুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। মজনু মারাত্মকভাবে আহত হন।

যেহেতু সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল তাই মুর্শিদাবাদও এর ব্যতিক্রম ছিল না। মুর্শিদাবাদে অসংখ্য পীর ফকির ও মাদারী ফকিরদের সমাধিক্ষেত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সম্ভবত এদের অনেকেই সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার সোনাটিকুরি গ্রামের মাদারতলায় সন্ন্যাসী ফকিরদের জমায়েত ও বিদ্রোহ ঘোষণা ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে জমিদার ও সামন্তগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। মজনু শাহের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুশা আলির সঙ্গে মজনুর পালিত পুত্র চেরাগ আলির বিদ্রোহের নেতৃত্ব দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় ও মুশা আলিকে চেরাগ আলি হত্যা করে। পরে মতিগীর নামে একজন বিদ্রোহী নেতা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চেরাগ আলিকে হত্যা করে। চেরাগ আলির সমাধি বহরমপুরের গোরাবাজারের নিমতলায় রয়েছে। সন্ন্যাসী-ফকির-বিদ্রোহের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সমাধি বহরমপুরে থাকায় প্রমাণিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলও এই কৃষক বিদ্রোহে অন্যতম কেন্দ্র ছিল। সম্ভবত চেরাগ আলি ছিলেন সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের নেতা। মুর্শিদাবাদের অত্যাচারিত রেশম চাষিরাও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজ কুঠি আক্রমণের মধ্য দিয়ে। যদিও ছোটখাট সংঘর্ষ এবং লড়াই ১৭৬০ সাল থেকেই শুরু হয়। এই বিদ্রোহে মোগল বাহিনীর কর্মচ্যুত সৈনিকরা বিরাটভাবে যোগ দেয়। এই বিদ্রোহ বিফল হওয়ার কারণ মূলত নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং খুনোখুনি। কিছু ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের মধ্যে শেষ পর্বে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়।

বিদ্রোহের শতবর্ষ পরে বঙ্কিমচন্দ্রের এক অমর সৃষ্টি আনন্দমঠ লেখা হয়। তবু এই উপন্যাসের বড় ত্রুটি এর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি যা সমালোচকের কাছে বিতর্কে রসদ জোগায়।

চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৯-৭০)

কান্দির রাজপরিবারের বিরুদ্ধে ঘটেছিল চোয়াড় বিদ্রোহ। মূলত ইংরেজদের অতিরিক্ত মাত্রায় খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে শুরু হয় এই আন্দোলন। সম্ভবত '৭৬-এর মন্বন্তরের অব্যবহিত আগে ১৭৬৯-৭০ সালে। একই সময়ে মেদিনীপুর চোয়াড় বিদ্রোহও ঘটেছিল। চোয়াড় পাইকরা ছিল আসলে বিভিন্ন রাজা মহারাজা এবং মোগল সৈন্যবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত বা পালিয়ে আসা সৈন্য। তারা তাদের পুরানো শ্রেণী অবস্থানে ফিরে যায় ও কৃষকে পরিণত হয় এবং সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটায়। এছাড়াও অরণ্য আদিবাসীদের ঘৃণাভরে চোয়াড় বলতো জমিদাররা। এই সময়েই কান্দির অত্যাচারী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃষকদের ওপর অত্যাচার চরমে পৌঁছায়। শুরু হয় দুর্ভিক্ষ— ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ কঙ্কালের মিছিল আর রাস্তাঘাটে হাজার হাজার শবদেহ। বিদ্রোহী কৃষকদের নির্মমভাবে দমন করে কান্দির রাজপরিবার।

প্রথম চোয়াড় বিদ্রোহ হয় ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে প্রায় ৪০০ মাইল ব্যাপী এলাকায়। ইংরেজদের অস্বাভাবিক খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে। ১৭৭৬ সালে এই অঞ্চলে মেজর রেনেল চোয়াড়দের হাতে নিহত হন। পরবর্তীকালে ১৭৯৯-এর ৬ এপ্রিল মেদিনীপুর শহর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি ও তাঁর সহযোগী নাড়াজোলের জমিদার চুনিলাল খানকে চোয়াড় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে ইংরেজরা বন্দি করে। রানি শিরোমণি ইংরেজ রাজত্বে প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী। চোয়াড় বিদ্রোহের আরেক নেতার নাম মাধব সিং।

রেশম চাষিদের বিদ্রোহ (১৭৮০-১৮০০)

মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প ছিল সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির চাইতে উন্নত। মুর্শিদাবাদী সিল্ক, বালুচরী ও মসলিনের তখন গগনচুম্বী চাহিদা ইউরোপের বাজারে। কারণ ইউরোপের রেশমী বস্ত্রের চেয়ে মুর্শিদাবাদ সিল্ক মসলিন বহুগুণ উৎকৃষ্ট। কবি লিখেছেন— 'বাংলার মসলিন বাগদাদ রোম চিন/কাঞ্চন মূল্যেই কিনতেন একদিন'। সোনার মূল্যে কেনাবেচা হত মসলিন, মলমল, মুর্শিদাবাদ সিল্কের। ইংলন্ডের তাঁতি ও বস্ত্রব্যবসায়ীগণ তখন প্রতিযোগিতায় পেরে না উঠে মুর্শিদাবাদী সিল্ক ও মসলিনের আমদানি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সিল্ক বস্ত্রের পরিবর্তে রেশমের কাঁচা মাল ইংলন্ডে পাঠাতে আরম্ভ করে। তারা মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প ধ্বংস করতে থাকে। পরিবর্তে সস্তায় রেশমসুতো সংগ্রহ করে

তা ইউরোপের বাজারে পাঠাতে থাকে। কাশিমবাজার, জঙ্গিপুর, মির্জাপুর বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ন্যূনতম মজুরি দিয়ে রেশম তাঁতি ও কৃষকদের চুষে নেওয়া হত। চরম অত্যাচার হত তাদের ওপর। তাঁত বুনতে যাতে না পারে তার জন্য তাদের বুড়ো আঙুল কেটে নেওয়া হত। এই চাষিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অনেকেই সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহে যোগ দেয়। ইংরেজ বানিয়ারা মুর্শিদাবাদের শুধু রেশম ও তাঁর বস্ত্রশিল্পই ধ্বংস করেনি, মুর্শিদাবাদের যাবতীয় কুটির শিল্পই ধ্বংস করে দিয়েছিল। হাতির দাঁতের শিল্প, কাঠ খোদাই শিল্প, কাঁসা শিল্প সহ প্রায় সব ধরনের কুটির শিল্প।

অধ্যাপক সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত তার *চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত* বইতে বলেছেন, "মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের সবুজ সমভূমি রেশম তাঁতিদের হাড়ে সাদা হয়ে গেছিল। জরিমানা, হাজত, বেত মারা, ঘরে আগুন দেওয়া, জোর করে চুক্তি করানো, কাপড় বুনতে না দেওয়ার জন্য আঙুল কেটে ফেলা থেকে সন্তান বিক্রয়, আত্মবিক্রয় বা ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়... কেননা, তারা ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর খুব নিকটেই।"

মুর্শিদাবাদের নসীপুরের কুখ্যাত দেওয়ান ইংরেজদের তাঁবেদার দেবী সিং-এর অত্যাচারে রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হিন্দু মুসলিম কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেবী সিং-এর রংপুরের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। ইংরাজ সৈন্যদের সহায়তায় দেবী সিং বিদ্রোহ দমন করে শত শত কৃষককে ফাঁসি দেয়। এটি ১৭৮১-৮৩ সালের ঘটনা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কৃষক ও কারিগরদের থেকে কী ধরনের মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করত এবং তাদের নিঙড়ে ছিবড়ে করে দিত তা একটি উদাহরণেই বোঝা যায়— ১৭৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে নিজামত শাসনে বাংলা থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে যেখানে ৬৪.৩ লক্ষ টাকা সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫) পরের বছর তা লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৭ লক্ষ টাকা আর ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর দাঁড়ায় ২৬৮ লক্ষ টাকা।

ওয়াহাবি-ফরাজী আন্দোলন (১৮৩১-১৮৭০)

ওয়াহাবি এবং ফরাজী আন্দোলন সশস্ত্র উপায়ে ইংরাজদের উৎখাত করতে চেষ্টা চালিয়েছিল। মুর্শিদাবাদের গরিব মুসলিম কৃষক এবং আদিবাসীরা ইংরাজ শাসনের বিরূদ্ধে অস্ত্র হাতে নেয়। এদের অনেকে সিপাহি বিদ্রোহে অংশ নিয়ে শহিদ হন। যদিও উচ্চবর্গের ধনী মুসলিমরা ইংরেজদের সাথে আপসে আইনি পথে আন্দোলন চালনা করতে সচেষ্ট হন।

১৮৩১ সালের মে মাসে 'বালাকোর্ট'র যুদ্ধে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে বলেছেন, "ওয়াহাবিরাই সর্বপ্রথম বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে ভারতবর্ষ হতে ইংরেজদের বিতারিত করবার জন্য এক দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তাছাড়া সিপাহি বিদ্রোহে এদের অনেকে অংশ নিয়ে শহিদ হয়, নির্বাসিত হয় আন্দামানে।" ড. শক্তিনাথ ঝা বলেছেন— "ফরাজী আন্দোলন সশস্ত্র পদ্ধতিতে ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়েছিল। মুর্শিদাবাদে ফরাজী মতবাদ ও গ্রামগুলির অলিখিত ইতিহাস সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার নীরব সাক্ষী।"

এই দুই আন্দোলনকে আপাতদৃষ্টিতে ধর্মসংস্কারমূলক মনে হলেও এটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের গোপন প্রস্তুতি। মুর্শিদাবাদে এরকম অন্তত একটি ফরাজী মতবাদী গ্রাম আমি নিজে দেখেছি। সেটি নওদা থানার দুধসর গ্রাম। এমনকি নওদারই শব্দনগর গ্রামেও একই প্রভাব লক্ষ্য করি। গোকর্ণের পাশে খোসবাসপুরেও গোঁড়া ফরাজীরা আছেন অনেক।

দক্ষিণবঙ্গে যেমন ওয়াহাবি আন্দোলনের বীর কৃষক নেতা ছিলেন 'তিতুমীর' তেমনি পূর্ববঙ্গে ফরাজী আন্দোলনের নেতা ছিলেন 'দুদুমিঞা'। দুদুমিঞা স্বাধীন রাজ্য গঠন করে, সেনাবাহিনী গঠন করেন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাও কায়েম করেন। অন্যদিকে তিতুমীর বারাসতের নিকট বাঁশের কেল্লা তৈরি করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেন।

১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে কামান ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত এক ইংরেজ বাহিনী নারকেলবেড়িয়া গ্রামে তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করতে গেলে ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার আহত ও পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। ১৭ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনীর আরেকটি দল গোবরডাঙ্গার ময়দানে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। তিতুমীরের কৃষক যোদ্ধারা সেদিন ইংরেজ সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়। ১৯ নভেম্বর বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের পর ইংরেজবাহিনীর কামানের গোলায় 'বাঁশের কেল্লা' বিধ্বস্ত হয়, তিতুমীর নিহত হন। তাঁর ভাগনে গোলাম মাসুম সহ প্রায় ৩৫০ জন কৃষক বিদ্রোহী বন্দি ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিতুমীরের আসল নাম ছিল নিসারত আলি। ঐ অঞ্চলের কৃষকদের কাছে তিনি স্বাধীন বাদশা হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

আর দুদুমিঞার নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় বিশেষত ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, ঢাকা, ২৪ পরগণায় ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। যা জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ সরকারের কাছে বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

এই দুই আন্দোলনের প্রভাব মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলকে আলোড়িত ও প্রভাবিত করে। সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্তের *চেনা মুর্শিদাবাদ অচেনা ইতিবৃত্ত* বই থেকে জানা যায় উনবিংশ শতকের "চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জঙ্গিপুর মহকুমায় ওয়াহাবি বা তরীকা-ই-মহম্মদীয়া আন্দোলনের প্রভাব দেখা যায়। ...মুর্শিদাবাদের পূর্বাঞ্চলে বা বাগড়ি এলাকায় এবং জঙ্গিপুর মহকুমায় বৃত্তিচ্যুত জোলা মুসলিমদের মধ্যেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল।"

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭)

মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও ভাগলপুরের ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল এলাকা দামিন-ই-কো নামে চিহ্নিত ছিল যেখানে ছিল সাঁওতাল আদিবাসীদের বাস। দামিন-ই-কো কথার অর্থ 'পাহাড়ের ওড়না'। এই ১৩৬৬ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৫০০ বর্গমাইল এলাকা ছাড়া সমস্ত অঞ্চলটাই ছিল শুধু পাহাড়। আর ' ৫০০ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ২৪৫ বর্গমাইল এলাকা ছিল আবাদযোগ্য, বাকি ২৪৬ বর্গমাইল এলাকা ছিল গভীর জঙ্গল। ১৭৭৯ সালে আগষ্টাস ক্লিভল্যান্ড ভাগলপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে পাহাড়িয়াদের জন্য দামিন-ই-কো-র সীমানা নির্ধারণ করে। সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, মালপাহাড়িয়ারা দামিন-ই-কো-র অর্থাৎ রাজমহল পর্বতের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে যেতে অস্বীকার করলো। তারা ক্লিভল্যান্ডের চাপানো করের বোঝা দিতে অস্বীকার করলো। তিলকা মাঝির নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ক্লিভল্যান্ড তিলকা মাঝির তীরে নিহত হল পাকুড়ে ১৩ জানুয়ারি, ১৭৮৪। তারপর ইংরেজদের সঙ্গে সুলতানগড়ের যুদ্ধে বাবা তিলকা মাঝি পরাজিত ও বন্দি হলেন। তাঁকে নৃশংসভাবে চাবুক মারা হল। তারপর ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে গোটা ভাগলপুর শহরটা হেঁচড়ে হেঁচড়ে ঘোরানো হল। তাতেও মৃত্যু না হওয়ায় ভাগলপুরে তিলকা মাঝিকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিল ইংরেজরা ১৭৮৫ সালে। তিলকা মাঝিই সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম শহিদ।

বড়লাট লর্ড বেন্টিক জঙ্গল এলাকা পরিষ্কার করে সাঁওতালদের বসবাস করার আহ্বান জানান। তিন বছর কর মুকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে তা রাখেননি। কটক, মানভূম, বরাভূম, ধলভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকে দামিন-ই-কো-তে প্রবেশ করতে শুরু করে দলে দলে সাঁওতাল। পাহাড় জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা হাজার হাজার বিঘা জমি তৈরি করল। সারাদিন উদয় অস্ত পরিশ্রম করে সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না রাতে হাঁড়িয়া মাদল নিয়ে নাচ-গানে মেতে উঠতো। ১৮৩৮ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে দামিন-ই-কো থেকে ইংরেজ সরকার দু'হাজার টাকা খাজনা আদায় করতো। ১৮৫১ সালে সেটা ২২ গুণ বেড়ে দাঁড়ালো ৪৩,৯১৮ টাকা ১৩ আনা ৫ পয়সা। ১৮৫১ সালে সাঁওতালদের জনসংখ্যা দামিন-ই-কো-তে ছিল ৮২,৭৯২ জন। গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৪৭৩। খাজনা আদায় হত ১১৩৪টি গ্রাম থেকে। বাকি গ্রামগুলি সেইসময় ছিল নিষ্কর। দামিন-ই-কো-র সমগ্র এলাকাই মোগল যুগে ছিল সুবে বাংলার অন্তর্গত। একসময় রাজমহল বাংলার রাজধানী ছিল মোগল শাসনে। তাই এই এলাকায় বাঙালির বসবাসও অনেক ছিল।

ইংরেজ লেখক W.W. Hunter তাঁর *The Annals of Rural Bengal* গ্রন্থের ২৮০ পৃষ্ঠায় বলেছেন, ''যে মুহূর্তে কোন সাঁওতাল কৃষক জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করতো সেই মুহূর্ত থেকেই ঐ হতভাগ্য সাঁওতাল কৃষক শোষণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়তো। সমস্ত বছর সে যতই পরিশ্রম করুক জমিদার মহাজন সমস্ত ফসলই নিজের গোলায় তুলত। যদি সে কখনো অতিষ্ঠ হয়ে পালাবার চেষ্টা করত জমিদারের পাইক পেয়াদা এসে সেই দরিদ্র সাঁওতালের গরু, মহিষ, বাসন-কোসন এবং ঘরের সব জিনিস লুঠ করে নিয়ে যেত, এমনকি সাঁওতাল বধূদের হাতের লোহার বালাও কেড়ে নিয়ে যেত। থানার দারোগারা ছিল জমিদার-মহাজনের দালাল এবং বর্বর নিপীড়ক। তারপর ছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচার। আর মিথ্যা মামলায় তাদের ঝুলিয়ে দিলে হয় ভাগলপুর বা জঙ্গিপুর আদালতে ছুটতে হত, কপর্দকহীন সাঁওতাল কৃষকদের সে সামর্থ্যও ছিল না। নীলকর সাহেবরা সারাদিন এমনকি সারারাত নীলকুঠিতে খাটাতো। রেলের ঠিকারদাররা সাঁওতাল বাড়িগুলিতে গিয়ে চূড়ান্ত অত্যাচার করত, ছাগল মুরগি বিনা পয়সায় কেড়ে নিয়ে চলে যেত। এবং এরা সবাই সাঁওতাল রমণীদের ওপর সুযোগ পেলেই অত্যাচার করত। এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাঁওতাল কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিল তাদের বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত। তারা ডাক দিল সাঁওতাল 'হুল'-এর।

১৮৫৫ সালের ৩০ জুন সাঁওতাল কৃষক নেতা সিধু ও কানুর আহ্বানে ভাগনাডিহি গ্রামের বটতলার এক জনসভায় দশ হাজার সাঁওতাল কৃষক শপথ নেন ইংরেজ সরকার, জমিদার ব্যবসায়ী মহাজনদের শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করে স্বাধীন সাঁওতাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবেন। আদিবাসীরা এখনও ৩০ জুনকে 'হুল দিবস' হিসাবে পালন করে থাকে। এই বিদ্রোহে শুধু সাঁওতাল কৃষকগণ যোগ দেন নি— হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিম্নবর্গের কৃষক জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিল। এছাড়া কামার, কুমোর, চামার, তেলি, গোয়ালা, ডোম, বাগদি, হাড়ি, জোলা, মোমিন, ভুঁইয়া, কারিগর শ্রেণী সহ সকল নিম্নবর্গের মানুষ যোগ দেয়। স্বভাবতঃই সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়ায় সর্ব সম্প্রদায়ের গরিব জনসাধারণের মুক্তিযুদ্ধ। দেশীয় সামন্ত, মহাজন, ঠগ, প্রতারক, উৎপীড়ক প্রশাসক এবং বিদেশি নীলকর ও সাম্রাজ্যবাদী বণিকদের বিরুদ্ধে এটা ছিল প্রকৃতই শ্রেণীসংগ্রাম। আর এই সংগ্রামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, কোনও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বা ধনিকশ্রেণী এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল। এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর 'দিল্লী চলো' এই শ্লোগানের ১১০ দশ বছর আগেই সিধু কানু 'কলকাতা চলো' এই শ্লোগান তুলেছিল। এটিই ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধের প্রথম প্রচেষ্টা এবং সর্বার্থে এক শ্রেণীসংগ্রাম।

১৮৫০ সালে ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের ওপর খাজনা বাইশগুণ বাড়িয়ে দেয়। বর্ণহিন্দু মহাজন এবং ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবীর দল তাদের দেনার দায়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে শুরু করে। উচ্ছেদ হওয়া সাঁওতালরা ভূমিদাসে পরিণত হয়। জমিতে ও বাড়িতে তারা বেগার খাটতে বাধ্য হয়। বাঙালি,

মাড়োয়ারি, ভোজপুরি মহাজনরা তাদের কাছ থেকে কোন শস্য কেনার সময় ব্যবহার করতো বেশি ওজনের বাটখারা যার নাম কোথাও ছিল বড়বৌ বা কেনারাম। আর বিক্রির সময় কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করতো ছোটবৌ বা বেচারাম। এর ফলে সাঁওতালদের শ্রমের ফসল তারা দুই হাতে লুটত। তারা অবাক হয়ে দেখত যত ফসলই তারা নিয়ে আসুক বিশ সের আর হয়না। তারা কাতর মিনতি করত, 'একবার বিশ বোল বাবু'। কারণ ১৯ সের হওয়ার পরই মহাজন আবার এক থেকে শুরু করতো। পাঁচকেঠিয়ার রাক্ষসী থানে বটগাছের তলায় পাঁচ সুদের কারবারিকে তারা বলি দেয়। মানিক চৌধুরী (দাঁ) অথবা মানিক মুদী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক চৌধুরী, নিমাই দত্ত ও হীরু দত্ত— এই পাঁচ দিকু দিক মহাজনকে তারা বলিতে চড়ায়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলাশাসক টুগুড ঔরঙ্গাবাদের নিকটে মহেশপুরে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে বহু বিদ্রোহীকে হত্যা ও বন্দি করেন ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুলাই। সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক কানহু সিধুর বিচার হয় জঙ্গিপুর কোর্টে। ফাঁসির রায় হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যাপকতা ছিল বিরাট। প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল কৃষক এতে যোগ দিয়েছিল। তার মধ্যে পঁচিশ হাজার বিদ্রোহী প্রাণ দেয়। ভারতবর্ষে আর কোন কৃষক বিদ্রোহে এত মানুষ প্রাণ দেয়নি। ব্রিটিশ বাহিনী এই গণহত্যায় লজ্জা না পেলেও বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিচারে সাঁওতাল বিদ্রোহ তুলনাহীন। ব্রিটিশ সেনানায়ক মেজর জার্ভিসের ভাষায়, 'এটি যুদ্ধ নয়— গণহত্যা'। একদিকে যেমন জোতদার, জমিদার মহাজন, দারোগা, নীলকর সাহেব, রেল কন্ট্রাক্টর সকলেই সাঁওতালদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করত। এই উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা দেশীয় শোষক ও বিদেশি শোষকের মধ্যে কোন প্রভেদ করেনি। এটি প্রকৃতই শ্রেণীযুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। থানা আক্রমণ, পুলিশ হত্যা, বন্দুক, কামান কেড়ে নিয়ে পুকুরে ফেলে দেওয়া (কারণ এগুলির ব্যবহার ওরা জানত না), মিলিটারির সঙ্গে লড়াই, কলকাতার উদ্দেশ্যে লঙ্ মার্চ— বিদ্রোহের সবরকম আয়োজনই তারা করেছিল। ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন করে গোটা বীরভূম মুর্শিদাবাদের একাংশ এবং ভাগলপুরের একাংশ তাদের দখলে চলে গিয়েছিল। তাঁরা দাবি তুলেছিল '**আমাদের নিজেদের হাতে শাসন চাই**'। মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে মহেশপুরে রাজবাড়ি আক্রমণ করে তারপর জঙ্গিপুরের দিকে অগ্রসর হয়ে তারা ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে। কিন্তু এই যুদ্ধ ছিল অসম। কারণ বিদ্রোহীরা আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানতো না, এমনকি তার ব্যবহারের কোন চেষ্টাও করেননি। মুর্শিদাবাদের নবাব সৈন্য, অশ্ব ও পঞ্চাশটি হাতি দিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করেছিল— সেই পঞ্চাশটি হাতিকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয় যাতে তারা পায়ে পিষে বহু সাঁওতালকে হত্যা করে তাদের ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মুর্শিদাবাদের নবাব ফেরাদুন জা ছাড়াও ভাগলপুরের জমিদার হেতমপুরের জমিদার বিপ্রচরণ চক্রবর্তী হাতি, লেঠেল ও রসদ পাঠিয়ে ইংরেজ বাহিনীকে সাহায্য করে। ১৮৫৫ সালের ১০ নভেম্বর ইংরেজ সরকার সামরিক আইন ঘোষণা করে : ''বঙ্গ দেশের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম হইতে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলটি সৈন্যবাহিনীর হস্তে ন্যস্ত হইল''। সাঁওতাল বিদ্রোহ তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন ও সহানুভূতি পায়নি। অথচ এই বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তারা জোতদার জমিদার মহাজন এবং ইংরেজ কর্মচারীদের এবং থানা পুলিশ উচ্ছেদ করে স্বাধীন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

অত্যাচারী মহেশলাল দত্ত অর্থাৎ মহেশ দারোগার হাতে গ্রেপ্তার হয় সিধু। ভাগনাডিহির কাছেই প্রকাশ্যে তাঁকে গুলি করে মারা হয়। মহেশ দারোগা সিধুকে হত্যা করার পরই ১৯৫৫-র ৭ জুলাই মহেশ দারোগাকে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বলি দেয়। একই সঙ্গে বলি দেওয়া হয় মানিকরাম মহাজন ও কেনারাম ভগতকে। এছাড়া একই সঙ্গে কয়েকজন বরকন্দাজ, চৌকিদার সহ ১৯ জন অত্যাচারীকে হত্যা করা হয়। যদিও সিধুর গ্রেপ্তার সম্পর্কে অন্যমতও আছে। ১৯ আগষ্ট, ১৯৫৫ মুনিয়া মাঝির বিশ্বাসঘাতকতায় সিধু মেজর শাকবার্গের হাতে আহত অবস্থায় ধরা পড়ে, পরে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সম্ভবত এই মতটিই সঠিক। ১২ জুলাই কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা পাকুড়ের রাজবাড়ি দখল করে। ১৫ জুলাই পাকুড়ের কাছে সেভেন্থ রেজিমেন্টের সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। তাতে সাঁওতালরা পরাজিত হয়। ১৬ জুলাই পিয়ালাপুরের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়। ২০ জুলাই বীরভূমের তালডাঙ্গা থেকে সাঁইথিয়া পর্যন্ত এবং রাজমহল-ভাগলপুর থেকে সমগ্র সাঁওতাল পরগণা দখলে চলে আসে বিদ্রোহীদের। ২১ জুলাই কাতনা গ্রামে ইংরেজ বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে। ২৩ জুলাই বীরভূমের গণপুর বাজার ধ্বংস হয়। এরপর ইংরেজ সৈন্যরা প্রায় শতাধিক সাঁওতাল গ্রামকে ধ্বংস করে দেয়। ২৪ জুলাই বহরমপুরের ম্যাজিস্ট্রেট টুগুড ভাগনাডিহি সহ শতাধিক গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেয়। দুমকার কাছে কানু ধরা পড়েন। ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ২টার সময় তাঁকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। চাঁদ ও ভৈরবের হয়েছিল যাবৎজীবন কারাদণ্ড। সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই আগুন কিন্তু নেভেনি। সেই টুগুডের বহরমপুরেই এক বছর পরেই জ্বলে ওঠে ১৮৫৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সিপাহি বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ। সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত।

দেখা যায় প্রতিটি বড় আন্দোলনে— বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রারম্ভে এবং তার চলমান অবস্থায় বিশেষত তার পরবর্তী প্রভাবে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোড়িত হয়। নতুন ধারার সাহিত্য সংস্কৃতির জন্ম হয়। সৃষ্টি হয় ইতিহাসের এগিয়ে চলার রসদ।

সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে বাংলার লেখক বুদ্ধিজীবীদের সেই সময় বিশেষ এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এটি ছিল একেবারেই ভারতের দরিদ্র আদিবাসীদের বিদ্রোহ। তৎকালীন বাবুসমাজ ও বাবু লেখকগণ একে ঘৃণার চোখেই দেখেছে। কিন্তু সাঁওতাল কৃষকদের এই অসম শক্তির বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ লড়াই এবং অভাবনীয় আত্মত্যাগে বাংলার তৎকালীন মধ্যবিত্ত সমাজ একেবারেই নিস্পৃহ ছিল একথা বলা যাবে না।

সাঁওতাল বিদ্রোহ চলাকালীন বিভিন্ন আখ্যায়িকা কাব্য, লোকসংগীত, লোককবিতা, পট অঙ্কন ও পটের গান এবং দু'একটি সংবাদপত্রের ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর* এবং গৌরীশংকর তর্কবাগীশের *সম্বাদ ভাস্কর*-এর কথা উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাগুলিতে বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও তীব্রতা এবং তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার বিভিন্ন রিপোর্ট এবং পাঠকদের মতামত বেরতো। বীরভূমের কবি কৃষ্ণদাস রায়ের (বাড়ি বীরভূমের কুলবুড়ি গ্রাম) আখ্যায়িকা কাব্য *সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া* আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। কবি দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর *পূর্ববঙ্গ গীতিকা*-র ২য় খণ্ডে তা প্রকাশ করেন। ড. রণজিৎ কুমার সমাদ্দারের ভূমিকা সহ লোকনাথ দত্ত নামে এক কবি ১৮টি সর্গে রচনা করেন *সাঁওতাল কাহিনী* নামে মহাকাব্যের অনুসরণে এক কাব্যগ্রন্থ। সুন্দর কাব্যভাষার অনায়াস ছন্দে গোটা সাঁওতাল বিদ্রোহকেই তুলে আনে কাব্যে। (দ্রষ্টব্য : ড. রণজিৎ সমাদ্দারের *সাঁওতাল গণযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠার বইটির দাম ছিল এক টাকা)।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ অবলম্বন করে অনেক উপন্যাস, নাটক, যাত্রা, গল্প, কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন— তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অরণ্যবহ্নি*, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক*, মহাশ্বেতা দেবীর *সিধু-কানুর ডাক*, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ির *ভাগনাডিহির মাঠ*, স্বর্ণ মিত্রের (উৎপলেন্দু চক্রবর্তী) *দামিন-ই-কো'র ইতিকথা* এবং নাটক মন্মথ রায়ের *সাঁওতাল বিদ্রোহ*, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মরেও যারা মরে না* এবং অসংখ্য কবিতা গল্প উল্লেখযোগ্য। (দ্রষ্টব্য : *সাঁওতাল গণসংগ্রাম : গতি ও প্রকৃতি*, অমল কুমার দাস, *পশ্চিমবঙ্গ* 'সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা' ১৪০২/১৯৯৫)।

এছাড়া এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সাঁওতাল কবি ও গীতিকারের জন্ম হয়। যারা সাঁওতালি ভাষায় অসংখ্য গড়ে oral songs and recitation তোলে। নৃত্য-গীত ও বাদ্য সাঁওতালদের এক সহজাত সংস্কৃতি যা তাদের মজ্জায় প্রবাহিত আবহমান কাল থেকে। সাঁওতাল বিদ্রোহকে উপজীব্য করে সাঁওতালি ভাষায় অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প রচিত হতে থাকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের ঠিক পরেই জন্ম ১৮৫৭ সালে মাঝি রামদাস টুডু-র, যিনি লিখিত সাঁওতালি ও আলংকারিক সাঁওতালি সাহিত্যের প্রথম লেখক। যদিও তাঁর লেখায় সাঁওতাল বিদ্রোহের বিশেষ প্রতিফলন দেখা যায় না। এরপর আধুনিক সাঁওতালি কাব্যের জন্মদাতা হলেন সাধু রামচাঁদ। তিনি বাংলা ছন্দকেও অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর 'জুরিছাঁদ' কিশোরদের জন্য একটি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহকে তেমনভাবে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব ও মূল্যায়ন শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকে। সাঁওতাল কবি মঙ্গলচন্দ্র লুমাঁম সরেন (১৮৯৮-১৯৯২)-এর কবিতায় আমরা প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের অগ্নিবর্ষণ দেখি। পরবর্তীকালে উপেন্দ্র কিসকু, নরেন হাঁসদা, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে প্রভৃতি কবি লেখকদের লেখায় সাঁওতাল বিদ্রোহ এক মর্যাদাময় স্থান দখল করে আছে। কী রকম সেইসব গান বা কবিতা একটি উদাহরণ :

নুসাঁসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হঁ বাকো তেঙ্গন্
খাঁটি গে বোন হুল গেয়া হো,
খাঁটি গে বোন হুল গেয়া হো,
দিশম দিশম দেশমাঞ্জহি পারগাণা....

অর্থাৎ

আমরা নিজেরাই বাঁচব / কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব / আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
দেশের মানুষ ও পারগাণারা
গ্রামের মোড়লরা আমাদের সাহায্য করবে
কেউ পাশে দাঁড়াবে না তবু বিদ্রোহ করব।

এই সাঁওতাল বিদ্রোহের আরও ৭৭ বছর পরে আরেকটি বড় সাঁওতাল বিদ্রোহ হয় দিনাজপুর-মালদহে। ১৯৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বর দিনাজপুরের সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের নেতা জিতু ছোটকার নেতৃত্বে সাঁওতালরা আদিনা মসজিদে ব্যূহ রচনা করে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। এই সময় সাঁওতাল নেতা জিতু ছোটকা নিহত হয় আদিনা মসজিদের মধ্যে। আদিনায় সেইসব গুলির দাগ এখনো রয়েছে। আদিনা আগে ছিল তীর্থংকর জৈন মন্দির।

সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭)

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল বিশ্বের সবথেকে বড় ঔপনিবেশিক বিরোধী বিদ্রোহ। এক লক্ষ কুড়ি হাজারের বেশি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় সৈন্য এতে অংশগ্রহণ করেছিল। বিশ্বে আর কোথাও এত পেশাদার সৈন্য কোন বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি। সেই সময় 'বেঙ্গল আর্মি' ছিল এশিয়ার সর্ববৃহৎ আধুনিক সেনাবাহিনী। এই সৈন্যরা ছিল কৃষকঘরেরই সন্তান। সামরিক পোষাক পরিহিতদের এই বিদ্রোহ ছিল প্রকৃতপক্ষে গণবিদ্রোহ।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সিপাহি বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ারে ১৮৫৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী। ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাতেই দেশীয় সেনাদের ১৯তম রেজিমেন্টের সেনারা স্কোয়ার ফিল্ডের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত (এখন যেখানে সেচ দপ্তরের আবাসন)

ম্যাগাজিন বিল্ডিং-এর অস্ত্রাগারের দখল নেয় এবং ব্যারাক ময়দানে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সেনাপতিরা দেশীয় সেনাদের বুঝিয়ে নিরস্ত্র করে ব্যারাকে ফেরত পাঠায়। আমাদের ছোটবেলায় এই ম্যাগাজিন বিল্ডিং-এর প্রাচীরে বিশাল বিশাল ক্ষতচিহ্ন দেখেছি যেগুলি শুনেছি কামানের গোলার। ড. শক্তিনাথ ঝা লিখেছেন— ''লোক কাহিনিতে শোনা যায় জেলা শাসকের বাসভবনের সামনে দক্ষিণপূর্ব কোণের ব্যারাকটি ছিল বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। কামান দিয়ে যাকে নিশ্চিহ্ন করে সিপাহীদের দেহ ফেলে দেওয়া হয় লালদীঘিতে আর তখন থেকেই এই পুষ্করিণীর নাম হয় লালদীঘি।'' একশো বছর ধরে নিপীড়নে জর্জরিত মুর্শিদাবাদের কৃষককুল এই সংবাদ পেয়ে পরদিনই হাজারে হাজারে বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ শহরে উপস্থিত হয় বিদ্রোহে যোগ দেবে বলে। তাদের বিশ্বাস ছিল নবাব তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু নবাব ফেরাদুন জা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সিপাহি বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ভারতের সিপাহি বিদ্রোহে এই ঘটনার প্রভাব বিরাট। এবং **বহরমপুরই সেই মহাবিদ্রোহের সূতিকাগার**।

১৮৫৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বহরমপুর ব্যারাকের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খুব শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়ে— প্রথমে ব্যারাকপুরে পরে সমগ্র ভারতবর্ষে। ২৯ মার্চ ৩৪নং নেটিভ ইনফ্যানট্রির তরুণ সিপাই মঙ্গল পান্ডে সহকর্মীদের কাছে বিদ্রোহের আহ্বান জানান। মেজর হিউসান এবং লেফটেন্যান্ট বগ্ মঙ্গল পান্ডেকে গ্রেপ্তার করতে এলে মঙ্গল পান্ডের গুলিতে বগ্ আহত হন। সামরিক আদালতে মঙ্গল পান্ডের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয় ৬ এপ্রিল এবং ৮ এপ্রিল ভোর ৫-৩০ মিনিটে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই সংবাদ মীরাট, লক্ষ্ণৌ সহ ভারতের সর্বত্র ক্যান্টনমেন্টগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ১০ মে মীরাটে বিদ্রোহী সেনাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলে সিপাহিরা ইউরোপীয়দের হত্যা করতে শুরু করে ব্যাপকভাবে। তারা দিল্লীর লালকেল্লায় পৌঁছে যান এবং শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তাকে হিন্দুস্তানের বাদশা বলে ঘোষণা করেন।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে দেশীয় সিপাহিদের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফিরোজপুর, মুজাফরনগর, আলিগড়, নওশেরা, জৈনপুরী, রুরকি, নাসিরাবাদ, মথুরা, বেরিলি, শাহাজানপুর, অযোধ্যা, মোরাদাবাদ, বারানসী, ঝাঁসি, এলাহাবাদ, কানপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা সহ সর্বত্র। বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে তাঁতিয়া টোপি, নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৮৫৭-র ২০ সেপ্টেম্বর দিল্লীর পতন হয়। বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করেন। তার দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে গুলি করে মারে ইংরেজরা। নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী ও লক্ষ্মীবাই-এর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ইংরেজদের নাস্তানাবুদ করে । সর্বস্তরে মানুষ এই বিদ্রোহে অংশ নিতে শুরু করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ব্যর্থতার কারণ— না ছিল কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, না ছিল বিভিন্ন বিদ্রোহী নেতার মধ্যে ঐক্য। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গোর্খা ও শিখরা ইংরেজদের সাহায্য করে এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে আসেনি।

সেই সময়ে কার্ল মার্কস এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে ভারতের সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে এবং এই মহাবিদ্রোহকে তিনি 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন।

মীরাটে অবস্থিত 'বেঙ্গল আর্মি'র সৈনিকদের আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের ধারণা ছিল বিস্ময়কর। স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তাঁরা 'রাষ্ট্রীয় সভা' (Court of Administration) গঠন করে এবং ১৮৫৭ সালের ১১ মে বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করে, কিন্তু জুলাই মাসে সম্রাটকে 'রাবারস্ট্যাম্প' করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় সভার হাতে পূর্ণক্ষমতা প্রদান করে।

যদিও ভারতে প্রথম সিপাহি বিদ্রোহ ঘটে ১৮০৬ সালে তামিলনাড়ুর ভেলোরে। সিপাহিরা বেতন বাড়ানো ও মর্যাদার দাবিতে বিদ্রোহ করে ভেলোর দুর্গের প্রায় ১৮০০ ভারতীয় সিপাই। তারা অস্ত্রাগার দখল করে এবং ইংরেজ সেনা ও অফিসারদের আক্রমণ করে। এরপরেও বেশ কয়েকবার বিভিন্ন কেন্দ্রে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছে বেতন ও মর্যাদার দাবিতে। কিন্তু এগুলির কোনটাই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ছিল না।

নীল বিদ্রোহ (১৮৬০)

নীলবিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল নদিয়া জেলায়, যেখানে ৫৬টি নীলকুঠি ছিল। মুর্শিদাবাদে ছিল ৪০টি। এটি ১৮৩০ সালের হিসাবে। নীলবিদ্রোহের নায়কদ্বয় দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের বাড়ি ছিল মুড়াগাছায় যা মুর্শিদাবাদ সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়। মুর্শিদাবাদের রেশমচাষকে ধ্বংস করে রেশম চাষি ও তাঁতিদের অকথ্য বর্বর অত্যাচার করেই এখানে নীল চাষে বাধ্য করা হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসাঁর পথিকৃত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাতটি নীলকুঠি ছিল। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে ছিল দুটি। দ্বারকানাথ এবং রামমোহন রায় নীল বিদ্রোহের সর্বপ্রকার বিরোধিতা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশ্বনাথ সর্দার, যাকে বাংলার 'রবিনহুড' বলা হত, তিনি নীল চাষিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে এক অত্যাচারী নীল কুঠিয়াল স্যামুয়ের ফেডিকে দমন করেন। ইংরেজরা তাকে বন্দি করে এবং ফাঁসি দেয়। তিনিই নীল বিদ্রোহের প্রথম শহিদ।

নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও যশোরের নীল বিদ্রোহের প্রভাব মুর্শিদাবাদেও পড়ে। মুর্শিদাবাদের চাঁদপুর-পাটকেবাড়ি, হরিহরপাড়ার চোঁয়া, বহরমপুরের আঁধারমানিক, রাঙামাটি, চাঁদপাড়া (কর্ণসুবর্ণ) শক্তিপুর, রামনগর, ভগবানগোলা, আখরী-গঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ বেনিয়াগ্রাম, জঙ্গিপুরে নীলকুঠি ছিল। এদের মধ্যে কয়েকটি নীলকুঠিতে কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। চাঁদপুর-পাটকেবাড়িতে নীল বিদ্রোহীরা এক নীলকর সাহেবকে হত্যা করে।

নীল বিদ্রোহের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদ কনসার্ণের সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। গোমস্তা তুফাজিল হোসেনের নির্মম অত্যাচারে তিন ছোট জোতদার মোরাদ বিশ্বাস, সৌহাস বিশ্বাস এবং লালচাঁদ সাহার নেতৃত্বে এনড্রুজ সাহেবের আনুকুরা কুঠি আক্রমণ করে। ঐ কুঠির ম্যানেজার ম্যাকুলিও এবং তার সহকারী রাইস সাহেবের স্ত্রী-মেয়েদের দিয়ে নীলগাছ কাটাবে বলে। কিন্তু তারা আগের রাতেই পালিয়ে যায়। জঙ্গিপুর ঔরঙ্গাবাদ এলাকায় দ্রুত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাক বাজিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম বেরিয়ে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়ে সভা করে লাঠি, তীর-ধনুক-বর্শায় সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন নীলকুঠি আক্রমণের পরিকল্পনা করতো। নীল চাষে বাধ্য করা যাবেনা— এই ছিল স্লোগান। মোরাদ, সৌহাস, লালচাঁদের নেতৃত্বে ১৮৬০ সালের ২০শে মার্চ কয়েকশো কৃষক গঙ্গা পেরিয়ে মালদহের কালিয়াগঞ্জে এনড্রুজ কোম্পানির বকরাবাদ নীলকুঠি আক্রমণ করে কয়েকটি বন্দুক ও তলোয়ার দখল করে। পরদিন আবার তারা গঙ্গার এপারে এসে ফরাক্কার কাছে বেনিয়াগ্রামে লায়ন্স সাহেবের কুঠি আক্রমণ করে ২১শে মার্চ ১৮৬০ সালে। লায়ন্স গুলি চালালে দুজন কৃষক মারা যায়। কিন্তু লায়েন্সের কুঠি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেইসময় স্টিমারে সরকারি বাহিনী এসে মোরাদ বিশ্বাসকে ধরে বহরমপুর নিয়ে আসে। পরে লালচাঁদ সাহা ও রতন মণ্ডল বহরমপুরে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শামসেরগঞ্জ থানার কাশিমনগর, নীরতলা, পাঁচগাছা সহ অনেক গ্রামে। মুর্শিদাবাদের এই অঞ্চলের বিদ্রোহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে পাঁচ সদস্যের নীল কমিশন তৈরি করে ১৮৬০ সালের ৩১শে মার্চ এবং আইন করে নীল চাষ বন্ধ করা হয়।

বঙ্গদেশে এই বিদ্রোহের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের অধিক নীল চাষি অংশগ্রহণ করেছিল। কৃষ্ণনগর থানার দারোগা গিরীশচন্দ্র বসু নীল কমিশনে ১৮৬০ সালে ১৭ জুলাই নীলকর সাহেবেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। নীলচাষিদের ওপর বীভৎস অত্যাচার নিয়ে 'নীল দর্পণ' নামে সাড়া জাগানো নাটক লেখেন দীনবন্ধু মিত্র। আর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) সৎ সাহসী ও তথ্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা নীলকর সাহেব, পুলিশ, মহাজন ও জমিদারদের অকথ্য অত্যাচারের রিপোর্ট এবং নীল বিদ্রোহের সপক্ষে সাহসী অবস্থান দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। মীর মোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটক জমিদার ও নীলকর সাহেবদের দস্যু প্রবৃত্তি ও অমানবিক শোষণ পীড়নকে উন্মোচিত করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতির মধ্যে কৃষক বিদ্রোহগুলি সম্পর্কে প্রগতিশীল ভূমিকা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যদিও এঁদের মধ্যে কেউই প্রায় সাঁওতাল বিদ্রোহের পক্ষে দাঁড়াননি। 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী', হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিকার কিছুটা প্রগতিশীল ভূমিকা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

হিজল কৃষক আন্দোলন প্রথম পর্ব (১৯৩৭-১৯৪৯)

'হি' অর্থে ভূমি + জল = হিজল, জলাভূমি। আবার বিস্তীর্ণ হিজল জুড়ে হিজল নামের বিশেষ ধরনের গাছের বন ছিল— এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। এখানে হিজল বিলও আছে। বর্ষায় হিজলে অধিকাংশ জায়গাই জলে ডুবে যায়— প্রায় ১৯ বর্গমাইল এলাকা। কর্নওয়ালিসের ১৭৯৩-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন পাশের পর কান্দির জেমো এবং বাগডাঙ্গার সামন্ত জমিদারদের স্থায়ী সম্পত্তিতে পরিণত হয় হিজল। ব্রিটিশ সরকারকে এরা হিজলের ওপর খাজনা দিত ২৮ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই। আর কৃষকদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে আদায় করতো লক্ষাধিক টাকা। এই বিপুল পরিমাণ খাজনা বলপূর্বক আদায়ের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সংগঠিত করে আরসিপিআই পার্টি। যদিও ১৯৩৫-এ পার্টি গঠনের সূচনা পর্বে নাম ছিল 'কম্যুনিস্ট লীগ'। দলের নেতা ছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের ভাই), পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই অঞ্চলের নেতৃত্বে পান্নালাল দাশগুপ্তরাই ছিলেন। যদিও আন্দোলনের স্বার্থে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুবার মুর্শিদাবাদ এসেছেন। ১৯১৮ সালে তিনি কম্যুনিস্ট ষষ্ঠ আন্তর্জাতিকে যোগ দিয়েছিলেন। এবং জার্মানিতে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছিলেন। হিজল কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের কৃষক সমিতির জেলা নেতা নরেন বিশ্বাস। ১৯৩৭ সালের ৮-৯ মে বেলডাঙ্গার রেল মাঠে কম্যুনিস্ট লীগের ডাকে একটি বিশাল কৃষকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অন্যান্য বামপন্থী কৃষকরাও যোগ দেয়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বক্তব্য রাখেন। এই সভাতে নরেন বিশ্বাস কৃষক সমিতির নেতা নির্বাচিত হন। বেলডাঙ্গার পর আরসিপিআই কৃষক সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন হয় কান্দি'র হ্যালিফক্স ময়দানে এবং হিজলে খাজনা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। ঐ ১৯৩৭ সালেই আরএসপিআই-এর নেতৃত্বে আর একটি বৃহত্তর কৃষক সম্মেলন হয় নওদার কেদারচাঁদপুর গ্রামে।

প্রাবন্ধিক অপরেশ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস উপেক্ষা করে নরেন বিশ্বাসের সুযোগ্য নেতৃত্বে হিজলের চাষিদের সংগ্রাম জমিদারদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। হিজলের বুকে এটাই প্রথম কৃষক সংগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত।'' এই আন্দোলনে অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন হাসিল হাজী, আন্দুলিয়ার তারাপদ গুপ্ত (মুর্শিদাবাদে আরসিপিআই-এর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা), জেমোর মৃগাঙ্ক চৌধুরী, বহরমপুরের সবিতা শেখর রায়চৌধুরী (আরসিপিআই-এর জেলা সম্পাদক)। ১৯৩৭-এর ৮ মে বেলডাঙ্গায় যে কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দাবি ওঠে— ১) জমিদারি প্রথার অবসান চাই, (২) সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, (৩) মহাজনী শোষণের অবসান চাই এবং গরিব

কৃষকদের সরকারি ঋণ দিতে হবে, ৪) পাট চাষিদের ওপর জুলুম বন্ধ করতে হবে, ৫) হিন্দু মুসলমান ঐক্য জিন্দাবাদ। বেলডাঙ্গা কৃষক সম্মেলন কম্যুনিস্ট লীগ (আরসিপিআই-এর পূর্বনাম)-এর উদ্যোগে সংগঠিত হয়। বলা যায় এই প্রথম মুর্শিদাবাদ কৃষক আন্দোলনে শ্রেণী সচেতন নেতৃত্ব শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। যদিও তখন আরসিপিআই (কমুনিস্ট লীগ), আরএসপি (১৯৪০-এ প্রতিষ্ঠিত) এরা ভারতের রাষ্ট্রচরিত্র বিশ্লেষণে সঠিক অবস্থানে ছিলেন না। তাঁর রাশিয়ার অনুকরণে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও আরসিপিআই-এ এই প্রশ্নে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পান্নালাল দাশগুপ্তের মতভেদ হয় পরবর্তীতে। এবং ট্যাকটিকাল প্রশ্নে গ্রাম শহরে একই সঙ্গে অভ্যুত্থান না চিনের কায়দায় গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা এই প্রশ্নে। পান্নালাল দ্বিতীয় পথের পথিক ছিলেন। এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হন। সুবিধাবাদী সংসদীয় পথ পরিত্যাগ করে সশস্ত্র উপায়ে কৃষকের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পক্ষপাতী ছিলেন।

সেইসময় মধ্য হিজলের কুখ্যাত জমিদার টিকু রাজা ও বিবেক রাজা (পিতাপুত্র - বিজয়েন্দু নারায়ণ রায় এবং বিবেকেন্দু)-র অত্যাচার ছিল বর্বরোচিত। বহু গরিব কৃষককে তারা খুন করেছিল, তাদের শিকার হয়েছিল সংখ্যাহীন কৃষক রমণী, নববধূ ও কিশোরীরা। তারা বাস করতো জাহাজ আকৃতির এক প্রাসাদে— নাম ছিল জাহাজবাড়ি। চারিদিকে ছিল জল। তারা ঘোড়ায় চড়ে সারা হিজল দাপিয়ে বেড়াতো। লেঠেলদের সঙ্গে নিয়ে কৃষকদের ঘর জ্বালিয়ে লুটপাঠ করে তাদের স্ত্রী কন্যাদের ধর্ষণ করে তাদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে চরম অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিত। এসবের বিরুদ্ধে কৃষকসভার নেতৃত্বে কৃষকরা প্রতিরোধ আন্দোলনে নামে। তারা খাজনা বন্ধের আন্দোলনও শুরু করে এবং দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।

হিজলের এই কৃষক আন্দোলনের প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কান্দি মহকুমায়, মুর্শিদাবাদের বাগড়ি অঞ্চলে, বীরভূমে, বর্ধমানে। এই সমগ্র অঞ্চলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি রিজিওনাল কমিটি গঠন করেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। এই কমিটিতে যারা বিভিন্ন সময়ে ছিলেন তারা হলেন—কান্দির কালী ভট্টাচার্য, কলগাঁয়ের সুখেন রায়, লালবাগের সলিল চক্রবর্তী ওরফে কানাই, পাকুড়িয়ার দুর্গা ব্যানার্জী, বীরভূমের কালতোড়ার শিবনাথ মণ্ডল প্রমুখ। এই সময় মুর্শিদাবাদ বীরভূম এবং বর্ধমানে কেতুগ্রামে আরসিপিআই মজবুত সংগঠন গড়ে তোলেন। কান্দি মহকুমার হলদী, কুণ্ডল, মুনীগ্রাম, শীতলগ্রাম, বরুটিয়া, কুনিয়া, মাটিয়ারা, হরিবাগান, হরিশচন্দ্রপুর এবং বীরভূমের পাকুড়িয়া, ঝিকরহাটি, মাঠবহড়া, কালতোড়া, সনৎপুর কার্যত মুক্ত এলাকায় পরিণত হয়।

এইসময় কান্দির কুণ্ডল গ্রামের নটুবিহারী দাসের বাড়িতে আরসিপিআই-এর গোপন সভা বসতো এবং নরেন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে রাইফেল ট্রেনিং দেওয়া হত। বেহালার কাশীনাথ চ্যাটার্জী ওরফে শম্ভু দাস এবং হাওড়ার অনাদি দাস রাইফেল ট্রেনিং করাতেন। এছাড়া কান্দি সংলগ্ন হরিবাগানের জঙ্গলে রাইফেল ট্রেনিং দেওয়া হত। জজান গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হয়েছিল।

হলদীর লড়াই (১৯৪৮-১৯৫২)

হলদী গ্রামটি কান্দি-সাঁইথিয়া রুটে খোরজুনা স্টপেজে নেমে বিল পেরিয়ে আরো তিন মাইল গিয়ে। সেই সময়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। খাজনা রদ, ভাগচাষিদের দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে জনমত গঠন, কৃষককে রাজনীতি সচেতন করা সবই চলছিল। উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ সাগরদিঘি হয়ে এ অঞ্চলেও এসে লাগে। ঠিক এরকম সময়ে হলদীর দুই কুখ্যাত জমিদার মহাজন ক্ষিতীশ ঘোষ এবং সতীশ ঘোষ চরম অত্যাচারী হয়ে ওঠে। সতীশ কৃষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত তার 'বাগাল'কে (এরা একপ্রকার ভূমিদাস ছিল) প্রচণ্ড মারধর করে। কৃষক সমিতির কর্মীরা দুজনকেই ধরে নিয়ে আসে (এবং সঙ্গে সাগরেদ গণেশ মন্ডলকেও) কৃষকদের গণআদালতের সহস্রাধিক মানুষের জমায়েতের মধ্যে। গণআদালত বসে ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট। তাদের ১০০১ টাকা জরিমানা এবং দশ হাত নাক্‌খত শাস্তি হয়, সেই সাথে তাদের বন্দুক গণবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নাকখত এবং জরিমানা প্রদান করলেও বন্দুক তারা দেয়নি এবং ছাড়া পেয়ে স্বমূর্তি ধারণ করে। মাজা ভাঙা সাপ ছোবল মারবেই। প্রচণ্ড অত্যাচার, পুলিশি নিপীড়ন নেমে আসে। হলদীতে পুলিশ ক্যাম্প বসে। কৃষক নেতা তারাপদ চক্রবর্তীকে জোতদারের গুণ্ডারা খুন করে। ফলশ্রুতিতে কান্দি, খড়গ্রাম, বড়এগ্রায় ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। আরসিপিআই ডাক দেয়— 'হলদীর লড়াই বিশ্বের লড়াই'। ঐ অঞ্চলের স্থানীয় নেতৃত্ব তখন ছিলেন জলদবরণ সরকার, দুর্গা ব্যানার্জী, বলরাম চট্টোপাধ্যায়। 'হিজল থেকে হলদী' নামক একটি প্রবন্ধে ড. বিষাণ কুমার গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষক আন্দোলন প্রকৃত অর্থেই শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়ে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল"। এরপর হলদীতে ব্যাপক অত্যাচার নেমে আসে। অসংখ্য কৃষককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মহিলা কৃষক নেত্রী গীতা ব্যানার্জী গ্রেপ্তার হন। কান্দি, খড়গ্রাম, বড়এগ্রায় এবং প্রায় সারা বীরভূমে এই সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে। কিন্তু মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের জায়গায় গরিব কৃষককে নেতৃত্বে নিয়ে আসা যায়নি। সাগরদিঘিতে সিপিআই এর নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন যেটুকু ছড়িয়েছিল তবু সেখানে আদিবাসী কৃষকদের থেকে লবা মাঝি, চাকু মাঝি, পুরাণ মৃধা এরা উঠে এসেছিল কিন্তু এখানে গরিব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে থেকে সেভাবে কাউকে নেতৃত্বে দেখা যায়নি।

১৯৪৮ সালে বীরভূমের 'যোগাই' গ্রামে অনুষ্ঠিত

আরসিপিআই-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষকের ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক পথকে সুগম করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। আরসিপিআই ঘোষণা করে, তথাকথিত স্বাধীন ভারতের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ হচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। সাধারণ নির্বাচন জনগণের 'হাড়িকাঠ'। তারা ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচন বয়কটের ডাক দেন এবং কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথে জঙ্গি কৃষক আন্দোলন ও গণবাহিনী গড়ে তোলা ও গণ আদালতে সবকিছুর বিচার করা থেকে মুক্ত এলাকা গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যান। ঠিক যেমনটি আমরা পরবর্তীকালে নকশালবাড়ি কৃষকসংগ্রামে লক্ষ্য করেছি। এই পর্বে সিপিআই-আরএসপি-র সঙ্গে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম আরসিপিআই নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে হতে থাকে। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলন তীব্র রূপ নিচ্ছে তেমনি অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় বিপ্লবী কৃষকরা প্রায় তিন হাজার গ্রামকে নিজামশাহী থেকে মুক্ত করে ফেলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ড. বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসি নেতারা তার কাছে জানতে চাইলেন মুর্শিদাবাদ-বীরভূম কি আরেকটি তেলেঙ্গানা হতে চলেছে। বিধান রায় দেরি না করে লরি লরি পুলিশ পাঠাতে আরম্ভ করলেন—এক অমানবিক নিপীড়ন নেমে এল। 'স্বাধীনতা কারে কয়' দেখিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী আর মুর্শিদাবাদ বীরভূমের দরিদ্র কৃষকরা তার অমৃত স্বাদ উপভোগ করতে লাগলেন। নিপীড়িত কৃষক ও সাধারণ মানুষের আইনি সাহায্যার্থে ১৯৫০-এর শুরুতেই বহরমপুরে গড়ে ওঠে 'ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ'। ১৯৫২ সালে কান্দির হ্যালিফক্স ময়দানে দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন হয় 'ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘের'। সম্পাদক বিজয় কুমার গুপ্ত, ভবানী ভট্টাচার্য সভাপতি, অরুণ ভট্টাচার্য এবং কান্দির কালীচরণ ভট্টাচার্য সহ-সম্পাদক।

১৯৫২-র জুলাই পান্নালাল দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হলেন। তীব্র নিপীড়ন এবং নেতৃত্বহীন অবস্থায় আরসিপিআই খণ্ড বিখণ্ড হল। আর তাদের কর্মীদের নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাসে এগিয়ে এল আরএসপি এবং সিপিআই। জঙ্গি কৃষক আন্দোলন আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়লো। এভাবেই মুর্শিদাবাদের কৃষক আন্দোলনের গৌরবময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

মুর্শিদাবাদের কৃষক আন্দোলনে পান্নালাল দাশগুপ্তের (১৯০৭-১৯৬৯) ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বস্তুত নকশালবাড়ি আন্দোলনের স্রষ্টা চারু মজুমদারের বহু আগেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন চিনের পথে গ্রাম দিয়ে শহর ধরার পথ ধরে সশস্ত্র কৃষকের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের পথে। বর্জন করতে হবে সংসদীয় পথের কানাগলি এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। তৈরি করতে হবে গণবাহিনী, গণআদালত। এই সময় পান্নালাল দাশগুপ্তের দশটি চিঠিকে 'দশ দলিল' হিসাবে কর্মীরা গীতার মত অনুসরণ করতো। এই দশ দলিল পরবর্তীতে বই আকারে প্রকাশিত হয়। অনেকটা চারু মজুমদারের 'আটটি দলিল'-এর মতো। চারু মজুমদারের আট দলিল যেখানে ছয়ের দশকে সেখানে পান্নালালের দলিল চারের দশকের শেষে। কিন্তু তাঁর সংগ্রামে যেটি বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়ে না তা হলো দরিদ্র ভূমিহীন কৃষককে নেতৃত্বে আনা, গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা, গণমুক্তি বাহিনীকে সশস্ত্র করা এবং ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করা। স্বভাবতই বাংলা পুলিশের দাপটেই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পান্নালাল দাশগুপ্তের পরিণতিও হতাশাব্যঞ্জক। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি গান্ধির মতবাদে আদর্শ গ্রাম গঠনে মন দেন। রাজনীতি থেকে দূরে থেকে বীরভূমেই তিনি কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলেন।

হিজল কৃষক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫২-১৯৬৯)

আরএসপি ১৯৪০ সালে গঠিত হলেও পঞ্চাশ দশকের আগে তারা মুর্শিদাবাদে বিশেষ সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। পান্নালাল দাশগুপ্তের গ্রেপ্তারের পর আরসিপিআই-এর আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসতেই তারা তাদের পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো কান্দি মহকুমায়। বিশেষত আরএসপিআই প্রভাবিত কৃষক সাধারণকে নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাসে তারা তাদের সংগঠনভুক্ত করলো। বিশেষত কান্দি ও বড়ঞায় তারা দ্রুত মজবুত সংগঠন গড়ে তুললো। হিজলেও তারা নতুন করে সংগঠন গড়ে তুললো।

ইতিমধ্যে ১৯৫০-এ বর্গাদারি আইন এবং ১৯৫৩-তে জমিদারি উচ্ছেদ আইন প্রণয়ন হয়েছে। ভাগচাষিদের দাবিদাওয়া নিয়ে তখন আরএসপি সংগ্রাম শুরু করে। ফলে খুব দ্রুত সমগ্র হিজল আরএসপি-র সংযুক্ত কৃষকসভার ছাতায় চলে আসে। ১৯৫২-তে ত্রিদিব চৌধুরী লোকসভা ভোটে দাঁড়ানোয় তার প্রচারে তাদের সংগঠন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু জমিদারি আইন পাশ হলেও হিজলের অবস্থা যথাপূর্বং থাকে। টিকুরাজা বিবেকরাজা জমি দখলে রাখার জন্য কংগ্রেস থেকে সিপিআই সদস্যপদ নেয় এবং গোটা হিজলের সিপিআই সংগঠনের দায়িত্ব নেয়। অত্যাচারী, বর্বর নারীলোলুপদের মহান কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের নেতা করে নেয়। এইভাবে ষোলভাগীর ঘের জেমোরাজাদের খাসতালুক হিসাবেই বিরাজ করে। সোনাটিকুরীর ঘের বহড়ার জমিদার গোলবদন ও চাঁদবদন ত্রিবেদীর দখলে থাকে। শ্রীকৃষ্ণপুর কলোনি নিরঞ্জন সাহা, আমতলা-ভেড়ামারা-কুঠারির ঘের নিমতিতার রাজাদের পূর্বের মতই থাকে। '৬৬-র খাদ্য আন্দোলন, '৬৭-র যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং নকশালবাড়ির সংগ্রাম হিজলের চাষিদের নতুন করে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে। সংযুক্ত কিষান সভার নেতৃত্বে তারা নিরঞ্জন সাহার ১৩৫০ বিঘা এবং নবাব বংশের সৈয়দ কাজেম আলি মির্জার ঘেরের ৩৫০ বিঘা জমি কৃষকদের মধ্যে বিলিবণ্টন করে। নিরঞ্জন সাহার গুলিতে সংযুক্ত কিষান সভার

চারজন কর্মী আহত হয়। লড়াই ছড়িয়ে পড়ে যোলভাগীতেও—টিকুরাজা বিবেকরাজার লেঠেলদের বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু এই সময়েই যোলভাগীর ঘেরে গরিব কৃষক গৌর সেখ বা গহর সেখকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়। সময়টা ১৯৬৯ সালের ২২ আগস্ট। প্রাবন্ধিক অপরেশ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, গৌর সেখই হিজল কৃষক আন্দোলনের প্রথম শহিদ। এইসময় জিগরী সেখ, হাফিজুদ্দিন গুরুতর আহত হয়। এরা সকলেই হিজলের রাণীপুরের বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনার পর আরএসপি জেলা নেতৃত্ব (তৎকালীন জেলা সম্পাদক ছিলেন সুহাস দাস) বিবেকরাজার সঙ্গে আপসরফা করেন এবং তার উচ্ছিষ্ট আট বিঘা জমি গৌর সেখের পরিবারকে পাইয়ে দেন।

হিজল আন্দোলনের সমগ্র পর্যায় জুড়েই হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতাল-আদিবাসী কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছিল। অনেক জমি দখলও করেছিল। কিন্তু তাদের তীব্র দারিদ্র এবং বামপন্থী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ভোট রাজনীতি তাদের পুনরায় মুষিকে পরিণত করে।

নওদার কৃষক আন্দোলন (১৯৬৬-১৯৭২)

আরএসপি-র সংযুক্ত কিষাণ সভার নেতৃত্বে নওদার বৃহৎ জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম বারবার জঙ্গি রূপ পায়। ১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনের সময় মজুতদার ও পুলিশের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই শুরু হয়। ১৯৭২ সালে কৃষক নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাস্তা ব্যারিকেড করে পুলিশের চলাচল বন্ধ করলে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। কৃষকদের লাঠির আঘাতে দুজন পুলিশ মারা যায় এবং ১২জন পুলিশকে সারারাত গৃহবন্দি করে রাখে চাষিরা। এই ঘটনায় ১৫০ জন চাষি ও কৃষক নেতাকে ৬ মাস জেল খাটতে হয়। এবং গঙ্গাধারীর বলাই রুদ্র সহ বৃহৎ জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।

ষাটের দশকের শেষ থেকেই নওদার বালি টুঙ্গি গ্রামের শিক্ষক এবং একদা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএস প্রখ্যাত গণসংগীতকার দিলীপ বাগচি নওদার কৃষকদের মধ্যে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন এবং কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু খুবই শীঘ্রই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান।

তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৫৩)

'জান কবুল আর মান কবুল রক্তে বোনা ধান
নিজের গোলায় ওঠাও'

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাত থেকে নতুন জমিদার শ্রেণীর হাতে পাকাপাকিভাবে প্রদান করা হল। জমির ওপর ন্যূনতম অধিকার হারানো ক্ষেতমজুর, ভূমিদাস বা ক্রীতদাস প্রথাও নতুন করে বৃদ্ধি পেল। বিলাতি পণ্যের বিক্রির স্বার্থে কুটির শিল্পগুলি পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করলো ইংরেজরা। রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি নির্ভর করতো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে রাজা-বাদশারা এবং গ্রাম সমাজ সেচের বিভিন্ন পরিকল্পনা করতো। পুকুর, দীঘি খনন, নিকাশি খাল বিলগুলির সংস্কার ও নাব্যতা বজায় রাখা এগুলি বন্ধ হল। নতুন জমিদার শ্রেণীর এবং ইংরেজ সরকারের এ ব্যাপারে কোন দায় ছিল না। জলপ্রযুক্তিবিদ স্যার উইলিয়াম উইলকক্সের বিখ্যাত গ্রন্থ *বাংলার প্রাচীন সেচ ব্যবস্থা*-তে সেই সেচ ব্যবস্থা ধ্বংসের মর্মান্তিক বিবরণ রয়েছে।

কুটির শিল্পগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার পর ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সদস্য চার্লস ট্রিভল্যান ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেন, "আমরা ভারতের ম্যানুফ্যাকচারারদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছি। এখন কৃষি ছাড়া কোন গতি নাই"। গ্রামীণ কুটির শিল্পের উৎখাত হওয়া মানুষের কিন্তু শিল্পে জায়গা হলো না— তারা কৃষিতেই ভিড় করলো। কৃষির ওপর চাপ বাড়লো। ভূমিহীন কৃষিমজুর এবং ক্রীতদাসের সংখ্যা বেড়েই চললো। এই সময় থেকেই অকর্মণ্য বাবু নতুন জমিদারশ্রেণী বর্গাপ্রথার প্রচলন করলো। কোথাও উৎপন্ন ফসলের জমিদার সাতভাগ কৃষক তিন ভাগ কোথাও ষাট-চল্লিশ অর্থাৎ জমিদার ষাটভাগ কৃষক চল্লিশ ভাগ, কোথাও পঞ্চাশ-পঞ্চাশ কোথাও উৎপাদিত ফসলের পুরোটাই জমিদার বলপ্রয়োগে নিজের খামারবাড়িতে তুলে নিয়ে তার ছিটেফোঁটা ভাগচাষিকে দিত। আর এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে সেই ভাগচাষিকে জমি থেকে উৎখাত করে অন্য চাষিকে ভাগচাষের অধিকার দিত সেলামি নিয়ে। আর এটাই ছিল জমিদারের কাছে প্রভূত লাভজনক। অকৃষকদের হাতেই জমি কেন্দ্রীভূত হতে থাকল। কৃষি মজুর, ভূমিদাস এবং বর্গাদারের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল।

আমাদের এই বহরমপুরেরই সুপণ্ডিত ড. রাধাকমল মুখার্জী তাঁর ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত *ভারতের ভূমি সমস্যা* গ্রন্থে বলেছিলেন, "ছোটচাষিদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে, জমিদার ও উৎখাত হওয়া কৃষকদের মধ্যে বৈপরীত্য বাড়ছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকদের শ্রেণীচেতনার মৃদু স্পন্দন বর্তমান কৃষিব্যবস্থার মোকাবিলার সম্মুখে দাঁড়াচ্ছে।" এই গ্রন্থে তিনি আরো একটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন—

১৮৪২ সালে চালের দাম ছিল ১ টাকায় ৪০ সের
(১ সের - ৯৩৭ গ্রাম)
১৯৫২ সালে চালের দাম হয় ১ টাকায় ৩০ সের
১৮৭২ সালে চালের দাম হয় ১ টাকায় ২৩ সের
১৯২২ সালে চালের দাম হয় ১ টাকায় ৫ সের।

আমার ছোটবেলায় ১৯৫৯/৬০ সালে চালের দাম ছিল ৬ আনা (৩৭ পয়সা) সের। বর্তমানে ২০১৩ সালে সাধারণ মানের চাল ১ কেজি ৩৬ টাকা।

বিংশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে এই তেভাগার লড়াই শুরু হয়ে পঞ্চাশ দশকের প্রথম পর্যন্ত তা চলেছিল। ভাগচাষি পাবে তিনভাগ আর জমিদার একভাগ— এই ছিল

মূল শ্লোগান। বঙ্গদেশের ১৯টি জেলায় কম বেশি এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় ষাট লক্ষ কৃষক এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিজ্ঞা করলো— 'আর দেব না আর দেব না রক্তে বোনা ধান হো'। আর ১৯৪৬ সালের রক্তাক্ত কলকাতা-নোয়াখালির রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে (যেখানে প্রায় এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়) প্রতিহত করেছিল ঐক্যের গানে।

চল্লিশের দশক ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দশক। চল্লিশের দশকের প্রথমে চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪২ সালে ভারতব্যাপী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের গণজোয়ার। ১৯৪৩-এ শুরু হল বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ নামে যা পরিচিত। শুধু বাংলায় মারা গিয়েছিল ৩০ লক্ষের বেশি দরিদ্র কৃষক। নেতাজি তার আইএনএ বাহিনী নিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দিয়ে এসে ভারত সীমান্তে আঘাত হানছেন। আন্দামান দখল করে ইম্ফল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। তারপর নেতাজির অন্তর্ধান। আইএনএ-র পরাজিত বন্দি বিপ্লবীদের বিচারপর্ব শুরু— তাকে ঘিরে ভারতব্যাপী আন্দোলন। ১৯৪৬-এ ভারতে ব্যাপক নৌবিদ্রোহ এবং তার সমর্থনে আন্দোলন। ১৯৪৬-এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্রিটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায়। নোয়াখালি, কলকাতা সহ বিভিন্ন স্থানে লক্ষাধিক নিরপরাধ মানুষের হত্যা। এরকম এক প্রেক্ষাপটে অন্ধ্রের তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন— যেখানে কৃষকরা প্রায় তিন হাজার গ্রামকে নিজামশাহী থেকে মুক্ত করেছিল। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় পঞ্চাশের দশকের প্রথমে এসে ব্যর্থ হয়। একইভাবে তেভাগার লড়াই-এও সংশোধনবাদী বিশ্বাসঘাতকতা নেমে এসেছিল।

তেভাগা আন্দোলনের বড় বৈশিষ্ট্য এটি ছিল রাজনীতি সচেতন আন্দোলন। কম্যুনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের পেছনে থাকলেও, কম্যুনিস্ট পার্টি কখনও এই আন্দোলনকে ক্ষমতাদখলের পর্যায়ে নিয়ে যায়নি। তেভাগা আন্দোলনের আর একটি বড় সাফল্য— অনগ্রসর, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষক সমাজকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষ মুসলিম, আদিবাসী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, মাহিষ্য কৃষকদের এক পতাকার নিচে লড়ায়ে সামিল করলো। তৈরি হল তাদের মধ্য থেকে একদল নেতা। তাছাড়া ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনের হিন্দু মুসলমান গরিব কৃষকদের ঐক্য এক বিশেষ প্রতিরোধ নিয়ে হাজির হয়।

প্রায় তেলেঙ্গানা বিপ্লবের সময়কাল বাংলায় ঘটে তেভাগা আন্দোলন। এর কেন্দ্র মূলত দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি হলেও তা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন মাধব দত্ত ও চারু মজুমদার (১৯১৫-১৯৭২)। মুর্শিদাবাদেও সেই আগুনের আঁচ এসে লাগে। যদিও মুর্শিদাবাদের তেভাগা আন্দোলনের যেমন কোন সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি, তেমনি তৎকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা সনৎ রাহাও এই আন্দোলন সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেন। ড. শক্তিনাথ ঝা-এর 'দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে অনন্ত ভট্টাচার্য' নামক অসাধারণ প্রবন্ধটি থেকে আমরা জানতে পারি তেভাগা আন্দোলন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বেশ কিছুটা বিস্তার লাভ করেছিল কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল খুবই হতাশাজনক।

এই সময় ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিতে সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার কর্মী, শিক্ষক, ব্যাংক কর্মী এবং শ্রমিক কর্মচারীরা ভারতের প্রায় সর্বত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ ১৯৪৬ সালেই মুর্শিদাবাদের ডাক-তার কর্মীরা এক ঐতিহাসিক অভূতপূর্ব ধর্মঘট করেন। পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী গৌরীচরণ ভট্টাচার্য তখন নবগ্রাম সাগরদিঘি এলাকায় কৃষক সংগঠন গড়ছেন। সাগরদিঘির লড়াকু আদিবাসী কৃষক লবা মাঝি তখন জেলা কমিটির নেতৃত্বে উঠে আসেন। সম্পাদক তখন ছিলেন রিক্সা চালক ভূপেন দত্ত (চন্মন)। সাগরদিঘি ও জিয়াগঞ্জ এলাকার পার্টির কৃষক নেতারা ছিলেন যেমন জিয়াগঞ্জের সমর অধিকারী (সাগরদিঘির কৃষক আন্দোলনে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা আছে), সাগরদিঘির আবদুস শহীদ মল্লিক (কচিবাবু), কালিপদ রায়, রবি চৌধুরী, ধীরেন খাঁ এবং আদিবাসী কৃষক নেতা লবা মাঝি ও চাকু মাঝি। ১৯৪৯-এর ১৬ অক্টোবর সাগরদিঘির নসিমপুরে গোপনে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনে তেভাগার দাবি ওঠে এবং তা গৃহীত হয়। এ অঞ্চলে কৃষক পেত ৩ ভাগ আর জমির মালিক পেত ৭ ভাগ। আদিবাসী কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। এবং উপরে উল্লিখিত পার্টি নেতাদের গোপনে আশ্রয় দেন। পুলিশি অত্যাচার ও পীড়ন শুরু হয়। নির্লজ্জ আপোষকামী পার্টি নেতারা জেলাশাসকের সঙ্গে মধ্যস্থতায় বসে আধাআধি ভাগের মীমাংসায় পৌঁছান। কিন্তু সরকারি দাঁত নখ ছিন্ন করতে থাকে এই আন্দোলনকে। ধরপাকড় শুরু হয়।

গ্রামে পুলিশ ঢুকলে কৃষক রমণীরা শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি ও কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করতো। আর 'ঝাঁটা বাহিনী' তৈরি করে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো।

আদিবাসী কৃষক সহ ১২জন পার্টি কর্মীকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আবদুস শহীদ মল্লিককে (কচিবাবু) দেশত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে বাধ্য করা হয়। সংশোধনবাদী পার্টি নেতৃত্ব নীরব থাকে। ১৯৫৩ সালের ২৬ জানুয়ারী এক জঙ্গি মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দরিদ্র কৃষক নেতা লবা মাঝিকে। পুলিশ হেপাজতে তাকে হত্যা করা হয়। এর আগে ১৯৫০ সালে আরেক বিপ্লবী কৃষক ক্ষুদিরাম মন্ডল, বাড়ি শক্তিপুরের নিকট সেকেন্দার গ্রামে— তাকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এভাবেই মুর্শিদাবাদের তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের কখনও মৃত্যু হয় না। পৃথিবীর কোন শাসক ও শোষকশ্রেণীই শ্রেণী সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারে

না। সে তার নিজের সমাজ বিবর্তনের নিয়মেই আত্মপ্রকাশ করে বারে বারে নতুন শক্তি নিয়ে নতুন ময়দানে নতুনতর কৌশলে। বিজয় অর্জন পর্যন্ত তার এই সংগ্রাম চলতেই থাকে।

শিশির দাস তেভাগার পটভূমিকায় এক অসাধারণ গবেষণাধর্মী উপন্যাস লেখেন। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) লেখেন *ঝড় ও ঝরাপাতা* উপন্যাস। আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) লেখেন 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ও 'হারাণের নাতজামাই'। শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৫-১৯৭৮) তাঁর 'তেভাগা' সিরিজে এক মর্মস্পর্শী চিত্ররূপ ধরে রাখেন। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৮১-১৯৯১), সোমনাথ হোড় তেভাগা লড়াইয়ের এক রূপময় দলিল তুলে ধরেন। আর মুর্শিদাবাদের চারণ কবি গুমানী দেওয়ান গাইলেন তেভাগা লড়াই নিয়ে "এই চাষারাই দীন দুনিয়ার সকল দুঃখনাশা"। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী সহ একঝাঁক গণসংগীতকার বাংলা মাতালেন। গণসংগীতকাররা গাইলেন "আর দেব না, আর দেব না/রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো"। আর সিনেমায় বিমল রায় পরিচালিত 'উদয়ের পথে' আলোড়ন সৃষ্টি করল। বলরাজ সাহানিরা তেভাগার পটভূমিকায় 'ধরতি-কে-লাল' প্রযোজনা করলেন। বোম্বাই সিনেমাজগত আলোড়িত হল। সলিল চৌধুরীর কাহিনী ও সংগীত নিয়ে সেই বিমল রায়ের পরিচালনায় বোম্বাই-এ তৈরি হল 'দো বিঘা জমিন'। সত্যেন বসু কলকাতায় তৈরি করলেন 'রিকসাওয়ালা' কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত। নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'-র তখন বিপুল জনপ্রিয়তা।

কিন্তু সেই জনপ্রিয়তাকে বাংলার শিল্পীরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। 'ধরতি কে লাল'-এর অসামান্য সাফল্যের পর চেতন আনন্দ তৈরি করলেন 'নীচা নগর' ১৯৪৬ সালে। ১৯৪৭-এ বিজয় ভাট তৈরি করলেন 'সমাজ কো বদল ডালো', ১৯৪৮-এ 'কল্পনা' উদয়শংকরের অসামান্য প্রতিভার রূপদান। তারপর ১৯৫০-এ নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' দেশভাগ, শ্রেণী শোষণ আর তেভাগা নিয়ে এক অসামান্য চলচিত্রায়ণ।

এই সময়ে অর্থাৎ চল্লিশের দশকে বাংলার শিল্প সংস্কৃতি এক অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিল— গণসাহিত্য, গণসংস্কৃতি, গণসংস্কৃতি, গণশিল্প তার এক অপার মহিমায় বাংলা তথা ভারতকে আলোড়িত করলো। সাধারণ মানুষের জন্য শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-সংগীতের সূচনা বলা যায় এই চল্লিশের দশককে। আর বহু শিল্পী সাহিত্যিকের জন্ম হল যারা নতুন চিন্তায় নতুন চেতনায় জনগণের মুক্তির গান গাইলেন, শুধু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নয় সমগ্র শোষণ থেকে মুক্তির গান। জনগণ যখন এগিয়ে যেতে চায় তখন তাদের এগিয়ে না নিয়ে যাওয়া দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, আর জনগণ যখন এগিয়ে যেতে চায়না তখন তাদের জোর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বামপন্থী হঠকারিতা। কী শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কী তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, কী তেভাগা কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট পার্টি এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের রাজনীতিই করেছিল।

শুধু তেভাগা নয় এই দশকে মিলেমিশে গিয়েছিল যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, কৃষক আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, নৌসেনা ও শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন— সবকিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এইসময় কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অসহনীয় জীবন নিয়ে লিখেছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, কমল মজুমদার, সোমেন চন্দ, শিশির দাস, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ। গল্প লিখেছেন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, মনোজ বসু, শচীন সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ওয়ালীউল্লাহ, ননী ভৌমিক, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ। কবিতায় সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরেশনাথ সান্ন্যাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখ। বিষ্ণু দে'র 'মৌভোগ' কবিতা আলোড়ন ফেলেছিল।

চিত্রশিল্পে অনন্য চিত্তপ্রসাদ সহ সোমনাথ হোড়, জয়নুল আবেদিন, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, সুধীররঞ্জন খাস্তগীর, শুভো ঠাকুর, অতুল বসু, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামকিংকর, সফিউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান, সুনীল মাধব সেন প্রমুখ। এঁদের অসামান্য চিত্রশিল্প আলোড়ন তুলেছিল।

সংগীতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, রমেশ শীল, নিবারণ পণ্ডিত, গুমানী দেওয়ান, ধনঞ্জয় মণ্ডল (ঝাঁকসু) প্রমুখ। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'আমরা তো ভুলি নাই শহিদ/একথা ভুলব না/ তোমার কলিজার খুনে রাঙাইলো কে আন্ধার জেলখানা', আর সলিল চৌধুরীর—

হেই সামালো! হেই সামালো
হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেব না, আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।।

এসব গান কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, আলোড়িত করেছিল মরণপণ লড়ায়ে।

নকশালপন্থী কৃষক আন্দোলন (প্রথম পর্ব : ১৯৬৮-৭৪)

২৯৬৭ সালের মে মাসে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম ঘটে। জ্যোতি বসু তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশ মন্ত্রী। সাত কৃষক রমণী দুই শিশু সহ এগারোজন কৃষকের মৃত্যু হয়। একদিকে জমি দখল অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ এবং সশস্ত্র উপায়ে এলাকা ভিত্তিক ক্ষমতা দখলের জন্য ছোট ছোট কমবাট গ্রুপ তৈরি করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা। এই আন্দোলন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতের প্রতিটি কোণে দাবানল সৃষ্টি করে। এই আন্দোলনের মূল স্থপতি ছিলেন চারু মজুমদার। ১৯৬৪ সালে সিপিআই দ্বিখণ্ডিত হয়ে সিপিএম

পার্টির জন্ম হল। কিন্তু চারু মজুমদার তাদের সমস্ত নীতির সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি 'আটটি দলিল' রচনা করে তাঁর প্রভাবিত অঞ্চল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও উত্তর দিনাজপুরের কর্মীদের কাছে ছড়িয়ে দিলেন এবং সেইমত গোপন সংগঠন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখলেন।

নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম ঘটে যাওয়ার পর সারা ভারতের বিপ্লবীদের নিয়ে গড়ে ওঠে সারা ভারত Revolutionary Co-ordination Committee এবং বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে 'নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রাম সহায়ক সমিতি'। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা-কে সভাপতি করে পুলকেশ মণ্ডলকে সম্পাদক করে এই সমিতি গড়ে ওঠে ১৯৬৭ সালেই। কান্দি সহ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় সমিতি সভা করে। বিভিন্ন সভায় বাইরে থেকে এসেছেন শৈবাল মিত্র, দিলীপ বাগচি প্রমুখ। তাঁরা দিকে দিকে নকশালবাড়ি গড়ে তোলার ডাক দেন। নকশালবাড়ি কৃষকসংগ্রাম সহায়ক সমিতিতে আরও যারা যুক্ত ছিলেন তারা হলেন— অশোক দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাসগুপ্ত, নিখিল ভট্টাচার্য, তাপস, বাসুদেব (গুপু), মৃণাল রায় চৌধুরী, প্রণব রায়, প্রশান্ত দত্ত, বেণীমাধব বাগচি, অলকেন্দু মজুমদার, কান্দির কৃষক নেতা কালীচরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। তখন মুখে মুখে সবাই গাইত 'তরাই জ্বলছে রে, জ্বলছে আমার হিয়া, নকশালবাড়ির মাঠ জ্বলছে সপ্ত কন্যার লাগিয়া'...।

১৯৬৭-র নভেম্বর মাসে ডোমকলের সাধিখান্দিয়ার সিপিএম সম্মেলনে কৃষকনেতা রঙ্গলাল শিকদার, ভোল্লার ডাক্তার, শিশগ্রামের রাজামিঞা সিপিএম নেতৃত্বের কাছে সশস্ত্র বিপ্লব নিয়ে প্রশ্ন রাখেন। তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে। তারা কোন সদুত্তর না পেয়ে নকশালবাড়ির সমর্থনে পুরোপুরি এগিয়ে আসেন। বহরমপুরের ছেলে কলকাতার শিক্ষকতা ছেড়ে বহরমপুরে আসেন শ্যামসুন্দর বসু কৃষক সংগ্রাম গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে আর শিলিগুড়ি থেকে আসেন অশোককৃষ্ণ ঘোষ ওরফে সমর ঘোষ ওরফে সলিল যিনি চারু মজুমদারের কাছেই রাজনীতি প্রাপ্ত— তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার ডাক দেন নকশালবাড়ি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির সদস্য এবং ছাত্রদের। নিজেরাও গ্রামে চলে যান— কান্দি থানার নবগ্রাম, সাঁওতালপাড়া, মুকুরা, মহালন্দী কলোনি গ্রামগুলিতে কৃষকদের রাজনীতি সচেতন করার কাজ শুরু হয়। প্রথমে কৃষকদের নিয়ে মিটিং মিছিল শুরু হয়। সেখানে শ্লোগান উঠত— 'কৃষক যদি বাঁচতে চাও, নকশালবাড়ির পথ নাও', 'নকশালবাড়ি দিচ্ছে ডাক জোতদার চল্লিশ কৃষক ষাট'। গড়ে তোলা হয় বিপ্লবী কৃষক সমিতি। ডোমকলের ভগীরথপুরের অত্যাচারী জমিদার বঙ্কু চৌধুরীর কাছারি বাড়িতে ফসল না তুলে কৃষক নিদের বাড়িতে নিয়ে যায় বিপ্লবী কৃষক সমিতির সিদ্ধান্ত মতো। জমিদার লেঠেল পাঠায় কিন্তু বিপ্লবী কৃষক সমিতির সদস্যরা তাদের বোঝায় এসো আমরা সবাই মিলে জমিদারের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে সংগ্রাম করি। এসো আমরা ৬০/৪০ ভাগের আন্দোলন করি, বর্গা উচ্ছেদ বন্ধ করি। মহাজনদের কাছ থেকে বন্ধকি জিনিস দখল করে যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিই। নিজেদের মধ্যকার বিবাদ আদালতে না নিয়ে গিয়ে বিপ্লবী কৃষক কমিতির সঙ্গে একসঙ্গে বসে নিজেরাই মীমাংসা করি। কৃষকরা নিজেরাই আশেপাশের গ্রামে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে বিপ্লবী কৃষক সমিতির কাজকর্ম বুঝিয়ে তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে লাগলো। এইভাবে ডাবকোই, গোবিন্দপুর, ছিরুটি, কর্ণসুবর্ণ গোকর্ণ, মহালন্দী, গোবরহাটি, অমিত্তা, রাঙামাটি, চাঁদপাড়া, যদুপুর, সোঙাই প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো সংগঠন। আজিমগঞ্জের রেলওয়ে শ্রমিকরা নকশালবাড়ি সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে এল তারা সাগরদিঘির যে অঞ্চলে তেভাগার লড়াই হয়েছিল সেখানে সংগঠনের কাজে হাত লাগালেন। সাগরদিঘির বাহালনগর, বোখরা, তেলেঙ্গুর, তারগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন বীরভূমের বারাগ্রাম-লোহাপুর সমেত আশেপাশর গ্রামে সংগঠন ছড়িয়ে পড়ে। গরিব কৃষক ফিরোজ, রুস্তম, দুলাল কৃষক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬৮-র সিপিএমের বর্ধমান প্লেনামের পর সিপিএম থেকে বেরিয়ে আসেন অন্ধ্রের নাগি রেড্ডি, পোল্লা রেড্ডি, মুর্শিদাবাদের অবিসংবাদী কম্যুনিস্ট নেতা অনন্ত ভট্টাচার্য। অনন্ত ভট্টাচার্য নকশালবাড়ি সংগ্রামের সমর্থনে বিবৃতি দেন এবং মুর্শিদাবাদ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল সিপিআই(এমএল) পার্টির জন্ম হয়। নতুন বিপ্লবী পার্টি গঠন ভারতবর্ষের বুকে এক প্রাণসঞ্চার করে। সারা ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই সিপিআই(এমএল)-এর প্রদেশ কমিটি গঠিত হয়ে যায়। ত্রিপুরা থেকে পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ু থেকে জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই। এমনকি এই মহাঘটনার প্রভাব পড়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতেও। বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গঠন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় প্রতিটি শহরে ও গ্রামে অভূতপূর্বভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে বাড়ি বাড়ি ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এসে আন্দোলনে যোগ দেয়। মনে হয় এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ভারত ইতিহাসের কোন আন্দোলনেই ইতিপূর্বে ঘটেনি।

'৬৯ সালের শেষ দিক করে নবগ্রাম সাঁওতাপাড়া মহালন্দী অঞ্চল নিখিল ভট্টাচার্যের ওপর পুরোপুরি দায়িত্ব দিয়ে শ্যামসুন্দর বোস এবং অশোক ঘোষ সাগরদিঘি, নলহাটি, রামপুরহাট সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার দায়িত্ব নেয়। নলহাটির বুজুং-ধরমপুর, পাহাড়, তকিপুর, লোহাপুর, রামপুরহাটের মারগ্রাম, বসোয়া বিষ্টুপুর, কুরুম গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সংগ্রাম গড়ে ওঠে। অসংখ্য দরিদ্র কৃষক ঘরবাড়ি ছেড়ে সংগ্রাম গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করে। রামপুরহাট এলাকার ভূমিহীন আদিবাসী কৃষকরা নেতৃত্বে উঠে আসে— দুর্গা মাল ওরফে অচিন, কুড়া মাল ওরফে রতন, বিপিন, দিলীপ ইত্যাদিরা।

১৯৬৯-৭০ সালে সারা ভারতবর্ষে বেশ কয়েকটি গেরিলা অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলায় নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি-ফাঁসিদেওয়া, মেদিনীপুরে ডেবরা-গোপিবল্লভপুর, বীরভূম, উড়িষ্যার কোরাপুট ও গঞ্জাম জেলা, বিহারের মুশাহারি, গয়াভোজপুর, উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরী, আসামের করিমনগর শিলচর, ত্রিপুরার ধর্মনগর, অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম, গুন্টুর প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদে নবগ্রাম, মুরুরা, সাঁওতাপাড়া, মহালন্দী কলোনী, গোকর্ণ, কর্ণসুবর্ণ, যদুপুর সোঙাই এলাকায় কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার কাজে নিখিল ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগ দেয় অরূপ চন্দ্র। ঐ অঞ্চলের দরিদ্র কৃষক কাশেম নেতৃত্বে উঠে আসে। ভরতপুর থানার মালিহাটি, কান্দরা, ভোল্লা, শিশগ্রাম, ভরতপুর, সালার, ঘোষপাড়া, নপাড়া, কেচুনে, তালিবপুর, টেঁয়া, বদ্যিপুর, সাহাপুর প্রভৃতি গ্রামে মজবুত সংগঠন গড়ে ওঠে রঙ্গলাল শিকদার, ভোল্লার ডাক্তার, সালারের বাঁকির মিঞা, মালিহাটি-কান্দরার বিকাশ চন্দ্র, ন'পাড়ার রন্টু কৃষক সংগ্রামের সংগঠক হিসাবে কাজ করতে থাকে। ফরাক্কায় বাসু, বিশ্বরঞ্জন ব্যানার্জী সংগঠক হিসাবে কাজ করতে থাকে।

ভরতপুর, কান্দি, রহরমপুর, সাগরদিঘি, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গিপুর, ফরাক্কা প্রায় সারা মুর্শিদাবাদ গ্রামাঞ্চল জুড়ে তীব্র কৃষক সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে বেশ কিছু জোতদার নিহত হয়। ফসল দখল হয়, বিপ্লবী কৃষক কমিটি গণ আদালত বসিয়ে জোতদারদের বিচার করতে আরম্ভ করে। গ্রামাঞ্চল থেকে জোতদার জমিদাররা পালাতে শুরু করে। কেউ কেউ বিপ্লবী কৃষক সমিতির কাছে আত্মসমর্পণ করে। যে জোতদার একসময় নির্দ্ধিধায় কৃষকদের হত্যা করতো সেই জোতদার কৃষকদের পায়ে ধরে জীবনভিক্ষা চায়। ভগীরথপুরের বঙ্কুবিহারীর মত জমিদার গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে সেখান থেকে পুলিশ পাঠাতে থাকে নিজের গ্রামে। কৃষক জনতা বুঝতে পারে তাদের এই ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে সশস্ত্র হওয়া প্রয়োজন। শুরু হয় বন্দুক দখল অভিযান এবং তা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে থানার নির্দেশ সত্ত্বেও তারা বন্দুক থানাতে জমা না দিয়ে বিপ্লবী কৃষক সমিতির হাতে অর্পণ করতে থাকে। সাগরদিঘি থানা এবং তৎসংলগ্ন নলহাটি রামপুরহাট প্রভৃতি থানা এলাকায় একের পর এক গ্রাম কৃষকরা বন্দুক হাতে শাসন করতে থাকে অপর দিকে অর্থনৈতিকভাবে জোতদারের ফসল দখল, বিলিবন্টন, জমি বাজেয়াপ্ত করা এসবই চলতে থাকে। '৭১ সালে সারা বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ সীমান্ত অঞ্চলে মিলিটারি নামানো হয়। সাগরদিঘির গরিব কৃষক ফিরোজ বন্দুক হাতে মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করে মারা যান। মিলিটারির অত্যাচার চরমে পৌঁছায়। জোতদাররা মিলিটারি নামানোতে উৎসাহিত হয়। জঙ্গিপুর এলাকার বালিয়া গ্রামে কৃষক সংগঠক জগবন্ধুকে জোতদারের গুন্ডাবাহিনী হত্যা করে। একইভাবে লালবাগের গঙ্গার পাশের গ্রামে এলাহীগঞ্জের ভূমিহীন কৃষক এবং সংগঠক আতাউর রহমানকে জোতদাররা পিটিয়ে হত্যা করে।

মিলিটারি অপারেশন বীরভূমের সংগ্রাম ধাক্কা খাওয়ার কিছুদিন পর শ্যামসুন্দর বোস এলাকা থেকে অন্তর্হিত হন। নলহাটি রামপুর সিউড়ি এলাকায় নতুন করে সংগঠনের কাজে পাঠানো হয় নিখিল ভট্টাচার্যকে, লালবাগ জিয়াগঞ্জের গ্রামাঞ্চলকে সংগঠিত করার জন্য পাঠানো হয় অরূপ চন্দ্রকে, সাগরদিঘি-জঙ্গিপুর এলাকাকে সংগঠিত করার জন্য প্রদীপ ভড়কে পাঠানো হয়, ফরাক্কা অঞ্চলে পাঠানো হয় তাপস দাশগুপ্তকে। এই পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৭২-র শেষভাগে অর্থাৎ ২৮ জুলাই, '৭২ লালবাজার পুলিশ লকআপে চারু মজুমদারকে হত্যা করার পর এবং বীরভূম সংগ্রাম ধাক্কা খাওয়া এবং শ্যামসুন্দর বোস অন্তর্হিত হওয়ার পর এইভাবে পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। নতুন করে বাংলা-বিহার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটি তৈরি হয়। দরিদ্র আদিবাসী কৃষক দুর্গা মাল ওরফে অচিনকে সম্পাদক করে অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন কুড়া মাল ওরফে রতন, অশোককৃষ্ণ, নিখিল, অরূপ, প্রদীপ, তাপস প্রমুখ। এই অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে মহিলা যেসব কর্মী কাজ করতেন তারা হলেন বীরভূমের সিক্তা, বহরমপুরের মিনতি, কাজল ও রুণা।

নতুন কমিটির নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ কৃষক সংগ্রামে আবার জোয়ার আসে বিশেষত লালবাগে-জিয়াগঞ্জ অঞ্চলে। গোটা তিয়াত্তর-চুয়াত্তর লালবাগ জিয়াগঞ্জের দু'পাড়ের গ্রামাঞ্চলেই জেগে ওঠে। এইসময়েই অর্থাৎ '৭৩ সালের প্রথমদিকে ভূমিহীন কৃষকনেতা আতাউর রহমানকে জোতদার বাহিনী পিটিয়ে মারে। অপরদিকে লালবাগের পূর্বাপাড়ের গ্রামগুলি— ভাণ্ডারদহ পেরিয়ে যে বিশাল অঞ্চল রয়েছে, হাসনাবাদ, মোতিগ্রাম, কাপাসডাঙ্গা সহ প্রায় কুড়িটি গ্রামের জোতদাররা হয় বিপ্লবী কৃষক কমিটির কাছে আত্মসমর্পণ করে নতুবা পালিয়ে যায়। ভাণ্ডারদহ বিল পেরিয়ে পুলিশ অন্তত একবছর এ অঞ্চলে ঢুকতে পারেনি। কৃষক সংগ্রামের নেতৃত্বে উঠে আসে হাসনাবাদের ভূমিহীন কৃষক মোসলেম। এছাড়াও একনিষ্ঠ কৃষককর্মী ছিল মোকরেম, আতর আলি, জহুরুল। সশস্ত্র গ্রামরক্ষী বাহিনী তৈরি হয়। বিপ্লবী কৃষক কমিটি ফসল বিলিবন্টনের কাজে হাত দেয়, বিপ্লবী কৃষক কমিটির আদালতে গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা করা হত। সশস্ত্র গ্রামরক্ষী বাহিনী ট্রেঞ্চ ও টানেল খনন করে।

এই লড়ায়ের পরবর্তী বিশ্লেষণে দেখা যায়— যেহেতু জমি দখল, ফসল দখল, মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন ইত্যাদি অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলি গেরিলা লড়ায়ের পাশাপাশি অনেকটাই উপেক্ষিত থাকে, তাই ব্যাপক পিছিয়ে পড়া ও রাজনৈতিক চেতনাহীন কৃষকদের এই লড়ায়ে ব্যাপক আকালে সামিল করা যায়নি। এছাড়া সমগ্র কৃষকসাধারণের সমর্থনের জন্য প্রয়োজন ছিল গ্রাম পুনর্গঠন, গ্রাম উন্নয়ন। যথা— শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, রাস্তাঘাট তৈরির কাজে হাত দেওয়া— এখানে স্বেচ্ছাশ্রমও গ্রামের মানুষের মানসিকতায় জোয়ার এনে দিতে পারত, বিপ্লবী

কমিটিকে তারা প্রাণের সরকার বলে ভাবতে পারত। এবং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ফৌজ তৈরির কথা তারাই ভাবত। অর্থাৎ একথা পরিষ্কার বিশ্লেষণে উঠে আসে— সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি অর্থনৈতিক আন্দোলন গ্রাম উন্নয়ন ও জীবনযাপনের মান উন্নয়নও পাশাপাশি করে যেতে হবে, না হলে শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিকল্প শোষণ মুক্ত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার বাস্তব স্বপ্নকে কৃষক দেখতে পাবেনা। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে—শুরুটা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই করতে হবে এবং পুরো এলাকাটি বিপ্লবী কমিটির আয়ত্তে আসার পথে অর্থনৈতিক আন্দোলন যেন প্রধান হয়ে না যায় অর্থাৎ লক্ষ্য থাকবে সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখল ও রক্ষা। না হলে সংশোধনবাদী বিচ্যুতি অনিবার্য। এটাই ঐ এলাকার সংগ্রাম থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে উঠে এসেছিল।

১৯৭৪-এর নভেম্বর মাসে রিজিওনাল কমিটির দুজন ক্যুরিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতায় মুর্শিদাবাদ বীরভূমের প্রায় গোটা নেতৃত্বই গ্রেপ্তার হয়ে যায়। নেতৃত্বহীন অবস্থা, নীতিগত প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে যাওয়া, সংগ্রামী এলাকার বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে সংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক চেতনার অভাব এবং পুলিশি পীড়ন এগুলিই ছিল সে সময়ের ব্যর্থতার কারণ। প্রায় পরিসমাপ্তি ঘটে মুর্শিদাবাদে নকশালপন্থী সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের প্রথম পর্বের (১৯৬৮-১৯৭৪)।

নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন ভারতীয় লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-চেতনায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও উন্নয়ন এনেছিল। চিত্রশিল্প, সংগীত, নাটক, সিনেমা, সাহিত্য (কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ) সমস্ত কিছুই এক নতুন বিষয় ও আঙ্গিকে সমৃদ্ধ হয়ে বিকশিত হতে থাকে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের নতুন মূল্যায়ন এবং ভারতীয় 'মনীষী'দের অতীত কার্যাধারার মূল্যায়ন শুরু হয়। এককথায় নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের প্রভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক চিন্তা চেতনা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির নিরীখে পরিচালিত হতে থাকে। নাটকে উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, হাবিব তনবীর, রতন থিয়াম, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, অসিত বসু, অমল রায় প্রমুখ, সিনেমায় ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনি, উজ্জ্বল চ্যাটার্জী, সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী, গুণময় মান্না, শৈবাল মিত্র, কবিতায় বীরেন চট্টোপাধ্যায়, কবি সমীর রায়, দ্রোণাচার্য ঘোষ, কমলেশ সেন, সৃজন সেন, সব্যসাচী দেব, নরারুণ ভট্টাচার্য, কবি শঙ্খ ঘোষ, গল্পকার মিহির আচার্য, স্বর্ণ মিত্র, শচীন বিশ্বাস, সংগীতে দিলীপ বাগচি, পরেশ ধর, অজিত পাণ্ডে, বিপুল চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ সাহা, নীতিশ রায় সহ একঝাঁক গণসংগীতকার। তাদের ধারাবাহিকতায় প্রতুল মুখোপাধ্যায়, কবীর সুমনরা আসেন। যারা সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিষয় ও আঙ্গিকে আলোড়ন তোলে। যাঁরা প্রাণিত করে তোলে নতুন প্রজন্মকে। ইতিহাস ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির প্রত্নখনন শুরু করে জেলায় জেলায় প্রাবন্ধিক সাহিত্যিকরা। প্রবন্ধে দীপঙ্কর চক্রবর্তী, অশোক চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, ইরবান বসুরায় (সব্যসাচী দেব), দেবব্রত পাণ্ডা, বসুমিত্র চৌধুরী প্রমুখদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আর মাতা ও পুত্রের অসাধারণ ভূমিকাও এখানে উল্লেখযোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' বাংলা সাহিত্যের একটি টার্নিং পয়েন্ট। আর নবারুণ ভট্টাচার্যের সেই অসাধারণ পঙক্তি 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' আলোড়িত করেছিল মানুষকে। আর অসমসাহসী প্রগতিশীল লিটিল ম্যাগাজিনগুলো দশকের শুরু থেকেই শুরু করে তাদের দুর্দমনীয় অভিযান। তাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্রে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণগুলো হয়ে ওঠে ধারালো।

নকশালপন্থী কৃষক আন্দোলন (দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৭৮-১৯৮৫)

১৯৭২-র চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর সিপিআই(এমএল) বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ গণ আন্দোলন, গণ সংগঠন, আইনি লড়াই, সংসদীয় গণতন্ত্র সহ বিভিন্ন ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। কেউ কেউ জাতপাত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগ্রামকেও শ্রেণীসংগ্রাম বলে ভাবতে থাকে। এর মধ্যেও কয়েকটি গ্রুপ শ্রেণী-সংগ্রামে অবিচল থেকে কৃষকসংগ্রামকে নতুন করে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী ছিল নিশীথ ভট্টাচার্য ও আজিজুল হকের নেতৃত্বে সিপিআইএমএল দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি। ১৯৮০ সালে মুর্শিদাবাদে ভরতপুর থানার সেহলাই গ্রামে তাদের মুর্শিদাবাদ কর্মী সম্মেলনে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া নেতা নিখিলেশ ভট্টাচার্য ওরফে উদয়কে আরসিএস-এর দায়িত্ব দেওয়া হয় পার্টি সম্পাদক নিশীথ ভট্টাচার্য এবং আজিজুল হকের উপস্থিতিতে। অর্থাৎ বাংলা বিহার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক হিসাবে। এরপর আবার ভরতপুর, বড়ঞা, কান্দি, খড়গ্রাম এলাকায় কৃষক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। নিখিল তার পূর্বতন এলাকা নলহাটি, রামপুরহাট, সিউড়ি আঁকড়ে থাকে। '৮২ সালের জুন মাসে নিখিল ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হয়ে গেলে '৮৩-র শেষ দিকে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রুপ পুনর্গঠিত হলে সীতারাম ঘোষ বাংলা-বিহার সীমান্ত আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

'৮১-তে কলেশ্বর মোড়ে পুলিশের কাছ থেকে বন্দুক দখল হয়। কান্দি মহকুমায় এটিই দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির বন্দুক দখলের প্রথম ঘটনা। '৮২-তে জেমোর জমিদার ত্রিবেদীদের বাড়ি থেকে বন্দুক দখল হয়। '৮৩-তে হিজলের বেরবাড়ির আলমিন সেখের বাড়ি থেকে বন্দুক দখল হয়। দুর্গাপুরে শিশির রায়ের বাড়ি ঘেরাও করে বন্দুক দখল হয়। মদনপুরে এক জোতদারের দেড়শো বিঘা জমির ধান প্রায় তিনশো জন ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বণ্টিত হয়। গুলিতে জোতদারদের একজন নিহত হয়। হিজলে কাদের সেখের জমির ধান ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি হয়। সন্তোষপুরে ১২ বিঘা জমি দখল করে ২২ জন ভূমিহীনের মধ্যে বিলি হয়। জেমো

রাজাদের কিছু জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি হয়।

১৯৮১-তে কান্দির কুণ্ডল গ্রামে গণআদালতে বিচার করে জোতদার জিতেন ঘোষের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং নকশালপন্থীদের হাতে তার মৃত্যু হয়। '৮২-র মে মাসে মারগ্রামের জোতদার সামসুদ্দিন সেখ নকশালপন্থীদের হাতে নিহত হয়। আলুগ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান হীরা সেখ নকশালদের হাতে নিহত হয়। ১৯৮২ সালে নিশীথ ভট্টাচার্য ও আজিজুল হক গ্রেপ্তার হলে নদিয়া থেকে তৎকালীন বামফ্রন্ট রাজ্য সরকারের খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র এবং জনৈক গোপাল দাসকে অপহরণ করে বাংলা-বিহার সীমান্ত আঞ্চলির কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং মুক্তিপণ হিসাবে দাবি করা হয় ধৃত নেতা কর্মীদের ছেড়ে দিতে হবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভরতপুর, বড়এঞা, কান্দি, খড়গ্রাম এবং সমগ্র হিজলে ইএফআর নামানো হয়। সরকার নকশালদের দাবি মানেনি। বাধ্য হয়ে একমাস পর কাশীকান্ত মৈত্র এবং গোপাল দাসকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাড়া পেয়ে খাদ্যমন্ত্রী নকশালদের ব্যবহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

'৮২-র মে মাসে মাহাদিয়া গ্রামে বৈদ্যনাথ ঘোষকে নকশাল সন্দেহে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং মেরে কান্দি থানার লকআপে ঝুলিয়ে দেয় আর আত্মহত্যার গল্প ফাঁদে। হরিসাধন মুখার্জী নামে একজন নকশালপন্থী কর্মী বীরভূম থেকে কান্দি অঞ্চলে কাজ করতে আসে বীরভূমের চিনপাই গ্রামে জোতদারদের গুলিতে নিহত হয়। সাটুইয়ে পার্টির দু'জন সক্রিয় কর্মী আতাউর ও মোস্তাফা পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। পুলিশ পেছন থেকে গুলি করে তাদের হত্যা করে। আতাউরের বাড়ি কাটাবাগানে, মোস্তাফার বাড়ি ভরতপুরের মদনপুর গ্রামে। ১৯৮৫তে হিজলের রাণীপুরে কাশেম আলির ১৪ বছরের ছেলে জিন্নারাইনকে নকশালপন্থী সন্দেহে কান্দি থানার পুলিশ (ওসি ছিলেন গোলাম মোস্তাফা) গুলি করে হত্যা করে। এভাবেই সেকেন্ড সিসি-র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। নেতৃত্বহীন, নিজেদের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব, পুলিশি পীড়ন এগুলোই ছিল কারণ। সবচেয়ে বড় কারণ অতীত আন্দোলনের অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ সারসংকলন না করতে পারা, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীতি ও কৌশল রচনা করতে না পারা। সোজা কথায় সঠিক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব। চিন্তার স্থবিরতা ও গোঁড়ামি।

উপসংহার

মুর্শিদাবাদের হাজার বছরের কৃষক আন্দোলনের এটি হল সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের কৈবর্ত কৃষক বিদ্রোহের পর ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী সমগ্র মোগল যুগেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তীব্র শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষক শ্রেণী বারবার কৃষক বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলও সেই কৃষক বিদ্রোহের অংশীদার। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৭৬০ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত ২২৫ বছরের মধ্যে এক ডজনেরও বেশি বড় বড় কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে মুর্শিদাবাদে। হয়েছে পরাধীন দেশকে বিদেশি শক্তির কাছ থেকে মুক্ত করার জন্য তীব্র গণ-আন্দোলন এবং বিভিন্ন সশস্ত্র লড়াই। এসবই ইতিহাসের চালিকা শক্তি এবং জনগণের প্রকৃত ইতিহাস। যদিও অধিকাংশ তথ্যই এখনও উদ্ধার করা যায়নি। রাজশক্তির সিংহাসন দখলের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি বাবা ছেলেয় কাটাকাটি বা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাদ ষড়যন্ত্র চক্রান্ত এগুলি ইতিহাসের গৌণ উপাদান। এইসব ঘটনাকে বড় করে দেখিয়ে সেই সময়ের মানুষের প্রতি শোষণ অত্যাচার তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, দুঃখ কষ্ট, পৃথিবীকে গড়ে তোলার জন্য তাদের হাড়-ভাঙ্গা উৎপাদন, পৃথিবীকে সাজিয়ে তোলার জন্য তাদের শিল্প সামগ্রী, স্থাপত্য এবং তাদের সংস্কৃতি সবকিছু সচেতন ভাবে চাপা দেওয়া হয়। রাজানুগ্রহে পুষ্ট ঐতিহাসিকরা এটাই করে থাকে। এভাবেই জনগণের প্রকৃত ইতিহাসের তথ্যগুলি, সূত্রগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

মূলত বিংশ শতকের ষাটের দশক থেকেই প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে ইতিহাস গবেষক, ইতিহাসের চর্চাকারী এবং প্রগতিশীল ঐতিহাসিকদের মধ্যে। যদিও মুর্শিদাবাদের এই বহরমপুর শহরে বসেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭২-এ প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাঙালিকে বাংলার প্রকৃত ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস লেখার ডাক দিয়েছিলেন। চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা সৃষ্টি ইংরেজদের চিরস্থায়ী কলঙ্ক বলে বর্ণনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। যদিও কুড়ি বছরের মধ্যে নিজের মত পরিবর্তন করে ১৮২৯এ *বঙ্গদেশের কৃষক* পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায় লেখেন— "এখন আর সেরূপ জমিদারদের অত্যাচার নাই, কৃষকদের অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে। অনেক স্থলে দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী জমিদার দুর্বল।' স্পষ্টতঃই কৃষক বিদ্রোহগুলির বিরোধিতা বোঝা যায়। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না— বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই উনবিংশ শতকের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে প্যারিচাঁদ মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত, কিশোরী চাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শিশির কুমার ঘোষ, প্যারীমোহন মুখার্জী, রেভারেন্ড লালবিহারী দে, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ কৃষক সমস্যা ও কৃষকপীড়ন নিয়ে এক ঝাঁক প্রবন্ধাবলী লিখেছিলেন। জনগণের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভূতপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গিও ইতিহাস চর্চাকারীদের উদ্বুদ্ধ করে। সাহিত্যে 'নীল বিদ্রোহ' নিয়ে দীনবন্ধু মিত্রের নাটক *নীলদর্পণ* মীর মোশারেফ হোসেনের *জমিদার দর্পণ*, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ বা হরিনাথ মজুমদারের ভূমিকা ইতিহাস গবেষকদের সঠিক পথ দেখাতে সাহায্য করে। তারপর ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের কৃষক বিদ্রোহ এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ওপর অসাধারণ অভূতপূর্ব কাজ ১৭৬৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত জনগণের ইতিহাসের এক অনন্য ধারাবাহিক দলিল। এছাড়াও প্রগতিশীল ঐতিহাসিকদের মধ্যে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি, ইরফান

হাবিব, রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

মুর্শিদাবাদে জন্ম নেওয়া খ্যাতনামা ঐতিহাসিক হলেন প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্নতাত্ত্বিক রামদাস সেন। এছাড়া মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তারা হলেন—শ্যামধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পি সি মজুমদার, নিখিলনাথ রায়, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন চন্দ্র নন্দী, সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, শক্তিনাথ ঝা, পুলকেন্দু সিংহ, খাজিম আহমেদ, রমাপ্রসাদ ভাস্কর, রবীন বিশ্বাস, প্রকাশ দাসবিশ্বাস প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ইতিহাস চর্চাকারী যারা মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণায় রত এবং প্রকৃত জনগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণে নিয়োজিত।

মুর্শিদাবাদের কৃষক আন্দোলনের এই রূপরেখা লিখতে বসে আমি সংসদীয় বিশেষত সরকারি দলগুলির নিরামিষ আপোষমুখী আবেদন নিবেদন এবং আইনি আন্দোলনের কোন আলোচনায় যাইনি। কারণ বস্তুত তা শেষ বিচারে শ্রেণী সংগ্রামের পর্যায়ে পড়ে না, তা কৃষক আন্দোলনও নয়। এটা তো পরিষ্কারভাবেই বলা যায়, কোনো সংসদীয় সরকারি দল শ্রেণীসংগ্রাম করে না। বস্তুত এই ব্যবস্থায় দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। বাড়ছে কাজ না পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। ভূমি থেকে প্রতিদিন উচ্ছেদ হচ্ছে তারা। খনি ও শিল্পের মোয়া দেখিয়ে মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, অন্ধ্র, উড়িয়্যা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে আদিবাসী কৃষকরা উচ্ছেদ হয়ে অসহনীয় দারিদ্র ও অত্যাচারকে সঙ্গী করে যাযাবর মানুষে পরিণত হচ্ছে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক শ্রেণীকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনাহার অর্ধাহার গ্রাস করেছে। অনাহারে মৃত্যু এবং ঋণভারে জর্জরিত হয়ে কৃষকদের আত্মহত্যা ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনেকে এই ব্যবস্থার দ্বারা বর্গা তথা ভাগচাষিদের নথিভুক্তিকরণ, ভূমিহীনদের সরকারের দ্বারা খাসজমি বিলিবণ্টনের কথা বলেন। কিন্তু এই সাময়িক ব্যবস্থা কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের নিদারুণ দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ছলে বলে কৌশলে সামন্তব্যবস্থা ছিনিয়ে নেয়। ভারতে সামন্ত ব্যবস্থার অবশেষ জাঁকিয়ে রয়েছে। এক ভয়ঙ্কর অমানবিক মধ্যযুগীয় বর্বরতা আমাদের মধ্যবিত্তর দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ত বয়ে চলেছে। পূর্বের যে কোনো যুগের চেয়ে তার গতি অনেক বেশি তীব্র। তাই এই ব্যবস্থায় আইনি আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী উপকৃত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীও উপকৃত হয় কিছুটা, কিন্তু এই ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকের কোন উপকারেই আসে না। রাজনৈতিক দিক থেকে বলা যায়, স্থানীয় সরকার অর্থাৎ পঞ্চায়েতগুলিতে প্রতিনিধিত্ব করাটা আর্থিক কারণেই তার কাছে বিলাসিতা। একই কারণে সামাজিক দিক থেকেও সে চূড়ান্তভাবে নিষ্পেষিত। মনে রাখতে হবে, যে কোন আন্দোলনকেই শ্রেণীসংগ্রাম বলা যায়না। যেমন অনেকেই— মানবাধিকার আন্দোলন, বন্দি মুক্তির আন্দোলন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে শ্রেণীসংগ্রাম বলে ভাবেন। এগুলি কখনও কখনও শ্রেণীসংগ্রামে আংশিক সহায়তা করলেও কখনই শ্রেণীসংগ্রাম নয়। এগুলির কোন বিশেষ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি নেই বা বিশেষ শ্রেণীর জন্য লড়াই করে না বরং শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জন্যই লড়াই করে আইনি পথে। তবে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি কে আঁকড়ে ধরে কৌশলে পরিচালিত করতে পারলে তা শ্রেণীসংগ্রামে অবশ্যই কিছুটা সাহায্যকারী ভূমিকা নিতে পারে।

তাই হাজার বছরের কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় দেখা যাচ্ছে বিদ্রোহ— কেবলমাত্র বিদ্রোহই কৃষকদের অধিকার অর্জনে সাহায্য করেছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওয়াহাবি বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ তার দৃষ্টান্ত।

যারা বলেন মুর্শিদাবাদে কোন কৃষক বিদ্রোহই হয়নি সে অর্থে— তারা যে সচেতনভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেন এবং অসত্য ও বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিপথগামী করেন এতে কোন সন্দেহ নাই। তাদের কাছে এ প্রবন্ধ একটি সোজাসাপটা উত্তর।

তথ্যসূত্র

১) *চেনা মুর্শিদাবাদ - অচেনা ইতিবৃত্ত*, সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত

২) *মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা, ১৯২৫-১৯৭৫* (প্রবন্ধ: 'দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে অনন্ত ভট্টাচার্য', ড. শক্তিনাথ ঝা)

৩) *নীল বিদ্রোহ*, পুলক চন্দ

৪) *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, সুপ্রকাশ রায়

৫) *সাঁওতাল বিদ্রোহ*, সুপ্রকাশ রায়

৬) *মহাবিদ্রোহ ও তারপর*, সুপ্রকাশ রায়

৭) '১৮৫৫-তে ব্রিটিশ সেনা, ২০০৯-এ রাজ্য পুলিশ : সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের চিত্র একই', দেবাশিস পাঠক, *প্রতিদিন*

৮) 'তিলকা মাঝির বিদ্রোহ', মণিপুষ্পক আচার্য, *প্রতিদিন*

৯) অপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের হলদী ও হিজল প্রবন্ধ, *কান্দি বীক্ষণ*

১০) *মুর্শিদাবাদ ফিরে দেখা*, ড. বিষান কুমার গুপ্ত

১১) 'মুর্শিদাবাদে নকশালপন্থী আন্দোলন', নিখিল ভট্টাচার্য, *মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্ত-২০০৪, বাসভূমি*

১২) কান্দি মহকুমায় নকশালপন্থী আন্দোলনের তিন দশক - অপরেশ চট্টোপাধ্যায়, *কান্দি বীক্ষণ*

১৩) *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত: তারিখ অভিধান*, অসিতাভ দাস

১৪) 'তেভাগা আন্দোলন ও মুর্শিদাবাদ', রমাপ্রসাদ ভাস্কর, *বাসভূমি*

১৫) 'কৈবর্ত বিদ্রোহ : একটি মূল্যায়ণের অভিমুখে', সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত, *বাসভূমি*

১৬) 'ইতিহাসে নওদা : কৃষক আন্দোলন', মফেজুল সেখ, *চাতক*, ২০১১

১৭) 'তেভাগা সংগ্রামের পৃষ্ঠপট', সুধী প্রধান, *পশ্চিমবঙ্গ*, তেভাগা সংখ্যা, ১৪০৪ / ১৯৯৭

১৮) 'ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ ও তার শিক্ষা', উপেন কিস্‌কু, পশ্চিমবঙ্গ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা ১৪০২/১৯৯৫

১৯) *পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি*, চিত্তরঞ্জন দাশ